অজানা

বীর বাঙালী

।। প্রণয় রায়।।

প্রকাশক
বলরাম ঠাকুর
শঙ্খনাদ প্রকাশন
৩৬-এ, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলকাতা - ৬

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশকাল : জন্মাষ্টমী, ২০১৯

মুদ্রক : আশুতোষ লিথোগ্রাফী কোম্পানী
৬, ছিদামুদী লেন, কলকাতা - ৬

মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

প্রাক্-কথন

পত্র-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে একটি স্বতন্ত্র ধারায় সমুজ্জ্বল। এই বাংলার বিভিন্ন সাহিত্যিক ও মনীষীদের প্রবাসকালীন পত্রাবলী একদিকে যেমন সময়কালীন ঘটনা, অপরদিকে তাঁদের ভাব ও ভাবনা শুধুমাত্র সেই পত্রের প্রাপকদের অবহিত করেছিল তা নয়, উত্তরকালের পথ বেয়ে সেই পত্রাবলী আজও আমাদের তৎকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও তার প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে ঋদ্ধ করে, সচেতন করে, উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি বহু মনীষীর পত্রাবলী, সাহিত্য, দেশপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা বিভিন্ন বিষয়ে জ্যোতিঃস্তম্ভের মতো আজও আলোক বিচ্ছুরিত করে চলেছে, বহু পাঠকের কাছে তা উত্তরণের দীপশিখা।

সাংবাদিক শ্রী প্রণয় রায় পত্র লেখার আদলে যে ইতিহাস কথনের সাহিত্যশৈলী সৃষ্টি করেছেন, তা অনন্য শুধু নয়, এককথায় অননুকরণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। ভেতো বাঙালী, ঘরকুনো বাঙালী কিংবা আড্ডাবাজ বাঙালীর তক্‌মা যে মিথ্যা শুধু নয়, তা যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মপ্রবঞ্চনা তা লেখক তার এই পত্রাবলী সাহিত্যের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছেন। তন্নিষ্ঠ ইতিহাসপ্রেমী লেখক ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের অতল সাগরে ডুব দিয়ে বাংলা ও বাঙালীর সভ্যতা, কৃষ্টি, বিক্রম, জ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে মণি-মুক্তা আহরণ করে ছোটো ছোটো পত্রের আদলে সংযত ও সুদৃঢ়ভাবে দক্ষতার সঙ্গে পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

'ঐন্দ্রিলা মুখার্জী' ছদ্মনামে 'ইতি তোমার মা' কলমে দেশাত্মবোধক সংবাদ পত্রিকা 'শঙ্খনাদ'-এ লেখকের এই পত্রাবলী নিকট অতীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক সমাজে হয়েছে সমাদৃত।

বিস্মৃত ও দিগ্‌ভ্রান্ত ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নবীন সাংবাদিক শ্রী প্রণয় রায় যে গভীর অনুসন্ধিৎসু মনে ইতিহাসের প্রান্তর থেকে বাংলা ও বাঙালীর গৌরবগাথাকে তুলে এনে অনবদ্য ভঙ্গীতে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন তা আজকের বাংলার নবীন ও প্রবীণ প্রজন্মকে দেশের সত্যিকারের ইতিহাস জানতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং জাগিয়ে তুলবে দেশাত্মবোধ— এ আশা করা যেতেই পারে।

আগামীদিনে এই লেখকের কলম আরও বেশি তথ্যনিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ হয়ে অসংখ্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করুক পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। ভারতমাতা কি জয়!

ডাঃ শিবাজী ভট্টাচার্য
সভাপতি
বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র
কলকাতা

সূচীপত্র—

সিংহলজয়ী বিজয় সিংহ	৫
গৌড়রাজ দনুজমর্দনদেব	৬
অপপ্রচারের বলি লক্ষ্মণ সেন	৮
রামায়ণ-মহাভারতের যুগে বাঙালী	১০
বীর সাধক শ্রীচৈতন্য	১২
রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী	১৫
বঙ্গরাজ শশাঙ্ক	১৭
ভারত জুড়ে বাঙালীর রাজ্য স্থাপন	১৯
ভারত-সম্রাট দেবপাল	২১
বাঙালীর বীরত্বে আলেকজাণ্ডার নত	২৩
যশোররাজ শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য	২৪
বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য	২৬
উত্তর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক ধর্মপাল	২৯
বিক্রমপুর-রাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায়	৩১
বীর সেনানায়ক দিব্য ও ভীম	৩৩
বিষ্ণুপুরের রাণী চন্দ্রপ্রভা	৩৫
বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক সীতারাম	৩৭
বীর চিলা রায়	৩৯
অতীশ দীপঙ্কর	৪১
ভূষণারাজ মুকুন্দ রায়	৪৩
বরিশালের বিক্রম	৪৫

সিংঘলজয়ী বিজয় সিংহ

প্রিয় ধৃতি,

প্রথমেই আমার ভালোবাসা নিবি। চিঠি পেয়ে হয়ত মনে করবি মা'র হঠাৎ হলটা কি! বর্তমান মোবাইল-নেট-এর যুগে আদ্দিকালের চিঠি! কিন্তু আমার বিশ্বাস, চিঠি পড়বার পর তোর মনে একটা অন্য রকম অনুভূতি হবে, তখন দেখবি তুই নিজের অজান্তেই আমার চিঠির অপেক্ষায় বসে আছিস। যাকগে, বাড়ির সকলে ভালো আছে। তোর ঠাকুমা তোর এয়ারফোর্সে যোগ দেওয়ার কথা শুনে ঘরে যতই মুখ ভারী করুক, পাড়াময় কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছে, 'আমাদের বাড়ির মেয়ে দেশের জন্য লড়বে।' আর তোর বাবা, ঠাকুরদার তো কথাই নেই, তারা যেন মেয়ে-নাতনীর গর্বে আটখানা! যাই হোক, যে জন্য এই চিঠি লেখা, গতকাল তুই ফোনে বলেছিলি তোদের ব্যাচের অনেকেই বলে— বাঙালীরা দুর্বল। তাদের ধারণা, যুদ্ধ লড়ার ক্ষেত্রে বাঙালী অযোগ্য। যুদ্ধ লড়ার কোনও ইতিহাস বাঙালীর নেই। এ জন্য মন খারাপ করিস না মা। এগুলি ধূর্ত ইংরেজদের অপপ্রচার। তারা বাঙালীদের ভয় পেত। বাঙালীর বীরত্ব, বুদ্ধি, দেশভক্তি ছিল তাদের সাম্রাজ্যের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক। তাই তারা বাঙালীকে অসামরিক জাতি, দুর্বল জাতি হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালায়। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার এত বছর পরেও এর সংশোধন হয়নি। দেশের জন্য ফাঁসিতে চড়তে যেমন বাঙালী ভয় পায়নি, তেমনি বোমা, গুলি চালাতেও হাত কাঁপেনি। সতের-আঠার বছরের বাঙালী কিশোরীরা বৃটিশদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিল এই সেদিন। তুই তাদেরই উত্তরসূরী। আজ তোকে বলি, প্রাচীন এক বাঙালী বীরের বীরত্বের কথা, যা কোনও অজানা কারণে ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। যদিও প্রামাণিক বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে ওই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ঘটনা। তখন রাঢ় বাংলা মানে এখনকার বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূমের আশপাশের অঞ্চলের রাজা ছিলেন সিংহবাহু।

প্রজাপালক রাজা সিংহবাহুর রাজত্বে প্রজারা সুখ-শান্তিতেই ছিল। যৌবনে রাজা সিংহবাহু খালি হাতে সিংহ মারেন, এজন্য তাঁর উপাধি হয় সিংহল। রাজার বড় ছেলের নাম ছিল বিজয় সিংহ। একদিন রাজা সিংহবাহুর কাছে এক প্রজা যুবরাজ বিজয় সিংহের নামে প্রজা পীড়নের নালিশ করে। রাজা সিংহবাহু এর সত্যতা যাচাই করে দেখেন যে, অভিযোগ সত্য। হবু রাজা বিজয় সিংহের এহেন আচরণে মহারাজা সিংহবাহু এতটাই রেগে গেলেন যে, যুবরাজকে দেশ থেকে নির্বাসনের শাস্তি দিলেন। পুত্রের শত আকুতি মিনতিতেও তিনি কর্ণপাত করলেন না। আসলে তৎকালীন ভারতীয় রাজারা প্রজাকে নিজ পরিবারের থেকেও বেশি ভালোবাসতেন। অভিমানী যুবরাজ বিজয় সিংহ নিজ সাতশত জন খাস সহচর সহ প্রকাণ্ড এক জাহাজে সওয়ার হয়ে অজানা দেশের উদ্দেশ্যে

বের হলেন। হঠাৎ সাগরে উঠল ঝড়। জাহাজ তখন নাগরদোলা। বেশ কয়েকদিন এভাবেই চলল। যুবরাজ বিজয় সিংহ ও তার সহচরেরা জাহাজের রুদ্ধ কক্ষগুলিতে মৃত্যুর প্রহর গুণছেন। এমন সময় ঝড় থামল। নাবিকেরা রুদ্ধ কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখেন, অদূরে স্থলভূমি। তারা আনন্দে নেচে ওঠেন। যুবরাজের কাছে খবর গেলে তিনিও বেরিয়ে আসেন। দ্বীপে পৌঁছে নোঙর ফেলে রাজকুমারের জাহাজ। কিছুক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে জানা গেল, জায়গাটার নাম তাম্রপর্ণী। যার আর এক নাম লঙ্কা। নির্বাসিত যুবরাজ এখানেই বসবাস করার নির্ণয় নিলেন। একে একে সহচরদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজেও স্থানীয় এক যুবতী কুবর্ণাকে বিয়ে করলেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ স্থানীয় রাজার সঙ্গে বিবাদ বাধল। এবার যুবরাজ তার সহচরদের নিয়ে যুদ্ধে গেলেন। সঙ্গে যোগ দিল সেখানকার স্থানীয় কিছু অধিবাসী, যারা বৈবাহিক সূত্রে এই সকল বাঙালী যুবকদের আত্মীয়। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। যুবরাজ বিজয় সিংহের বাহিনী শেষপর্যন্ত বিজয়ী হল। নিজ পিতার স্মৃতিতে যুবরাজ বিজয় সিংহ দেশের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন সিংহল। এই ভাবে সিংহলে বাঙালীর বিজয় পতাকা উড়ল। আজও শ্রীলঙ্কার বেশিরভাগ অধিবাসী নিজেকে সিংহলী বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। অবশ্য পিতার আদেশ মান্য করে যুবরাজ আর বাংলায় ফেরেননি।

'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ
তার কিনা এই ধুলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্নবেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ?'
ভালো থাকিস মা।

ইতি— মা

গৌড়রাজ দনুজমর্দনদেব

প্রিয় ধৃতি,

আজ যখন পিওনটা এসে হাতে কয়েকটা খাম গুঁজে দিয়ে গেল, প্রথমে মনে করেছিলাম এগুলি হয়ত নিত্য আসা ইন্সরেন্স বা কোম্পানির কোনও চিঠি। তাই ভেবে টেবিলে এগুলি রাখতে গিয়েই পেলাম তোর সাদা খামটা। সত্যি বলতে কি, কি যে আনন্দ পেয়েছি, বোঝাতে পারব না তোকে। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে বসলাম তোর চিঠি পড়তে। আমি যেন সেই কুড়ি বছর আগের সদ্য কলেজে পা দেওয়া তরুণীটি। তখন

দিদির চিঠি পেলে ঠিক এইভাবেই পড়তাম। তুই লিখেছিস আমার আগের চিঠিটা তুই তোর বন্ধুদেরও পড়ে শুনিয়েছিস। তারাও তাদের ভুল বুঝেছে। তুই আরও বীর বাঙালীর কথা জানতে চেয়েছিস। ঠিক আছে, আজকে তোকে শোনাই রাজা গণেশের কথা। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ, সারা ভারত জুড়ে হিন্দু শক্তি ও ইসলামী শক্তির লুকোচুরির লড়াই চলছে। কখনও দিল্লীর বাদশাহর বিজয় পতাকা উড়ছে তো কখনও হিন্দু বীরদের গেরুয়া ধ্বজ। এ যেন মেঘ-রৌদ্দুরের খেলা। তুই হয়ত বলবি ইতিহাসের পাতায় তো শুধু ইসলামের জয়যাত্রার কথাই লেখা আছে, সেখানে তো কোনও হিন্দু বীরের কথা নেই। এর উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, ইসলামী বাদশাহরা যদি এতটাই নিরঙ্কুশ হত তবে বছর বছর রাজ্য জয়ে বের হতে হতো না তাদের। কেনই বা সর্বগ্রাসী ইসলামী সাম্রাজ্য হিন্দুস্থান থেকে হিন্দু সভ্যতা ধ্বংস করতে পারল না! এর উত্তর কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিক বা বর্তমান মেকি সেকুলারবাদী ঐতিহাসিকরা দেয় না। আসলে বাদশাহদের রাজত্ব শুধু দিল্লী অঞ্চলেই সীমিত ছিল। দস্যুদল যেমন সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে হানা দেয়, তারাও ফি-বছর লুটের লোভে হিন্দু অঞ্চলে হানা দিত। কখনও সংঘর্ষ হত, কখনও হিন্দুরা প্রতিরোধ করত, কখনও ইসলামী সেনা আসার আগেই গ্রাম ধ্বংস করে হিন্দুরা জঙ্গলে চলে যেত। কখনও হিন্দু নারীরা পালন করত জহরব্রত। কখনও আবার হিন্দু সেনা ইসলামী দস্যুদের ধ্বংস করে দিত। যেহেতু বর্তমান ঐতিহাসিকরা তৎকালীন বাদশাহদের অন্নভোগী, চরম হিন্দুবিদ্বেষী, মুসলমান লেখকদের গ্রন্থনির্ভর ইতিহাস রচনা করে, তাই সত্যটা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। যেমন এই ক'দিন আগের বিপ্লবীদের মরণপন লড়াই। সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ, নেতাজীর কথা চেপে যাওয়ার অপচেষ্টা চলছে। মেকি ঐতিহাসিকরা বলে, প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস রচনা করেনি। সত্যিই যদি তাই হয়, তবে গ্রন্থহীন ভারতবর্ষের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার লাগাতার চার মাস ধরে পুড়ল কেন? দুই এক দিনেই তো ধ্বংস হওয়া উচিত ছিল। শত সহস্র বিশ্ববাসী শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসত কেন? বড় বড় মন্দির ধ্বংসের কথা চেপে যাও, মন্দির সংলগ্ন গ্রন্থাগার ধ্বংসের কথা চেপে যাও— এই হল আমাদের মেকি ইতিহাসবিদদের আপ্তবাক্য। এবার আসি রাজা গণেশের কথায়। রাজা গণেশ ছিলেন ভাতুরিয়া ও দিনাজপুরের ভূস্বামী। ভাতুরিয়া বলতে বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা রাজশাহী অঞ্চল। গৌড়ের ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহকে হটিয়ে ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মসনদে বসেন রাজা গণেশ। রাজা গণেশের ছিল বিরাট সৈন্যবাহিনী। ফলে দিল্লির ইসলামী বাদশাহরা পীর ফকিরদের শত আহ্বানেও রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে নামেনি। রাজা গণেশও দেশময় ছড়িয়ে থাকা মুসলমান শাসকদের গুপ্তচর এই সকল পীর-ফকিরদের দেশছাড়া করেন। গৌড় সাম্রাজ্যে আবার গৈরিক পতাকা উড়তে শুরু করে। রাজা গণেশ রাজ্যের রাজধানী পাণ্ডুয়া থেকে গৌড়ে নিয়ে আসেন। তিনি দনুজমর্দনদেব এই উপাধি নেন। তিনিই প্রথম বাংলা অক্ষরে

সংস্কৃত ভাষায় লেখা পাণ্ডুনগর, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম ও চাটিগ্রাম— এই চার জায়গার টাকশাল থেকে অজস্র রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রিত করান।

১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশের মৃত্যু হয়। হাফ ছেড়ে বাঁচে মুসলিম শাসকেরা। শেষ হয় বীরত্বের এক স্বর্ণময় অধ্যায়।

আজ এখানেই শেষ করছি। বন্ধুদের আমার শুভকামনা দিস।

ইতি— মা,

অপপ্রচারের সাক্ষী লক্ষ্মণ সেন

প্রিয় ধৃতি,

আশা করি পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছিস। আমরা এখানে সবাই ভালো আছি। এবার শীতটা ভালো পড়েছে। তোর ঠাকুমার শরীরটা মাঝে একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভালো আছে। আর তোর সহকর্মীরা সকলে ভালো আছে তো? তাদের আমার ভালোবাসা জানাবি। এখন বাড়ির সকলেই তোর চিঠির অপেক্ষায় বসে থাকি। এতে এক অন্য রকম ভালোলাগার অনুভূতি রয়েছে, যা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। গতকাল তোর একটা লম্বা-চওড়া চিঠি পেলাম। গত চিঠির রেশ ধরে তোর ও তোর বন্ধুদের মনে বহু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তার উত্তর চেয়েছিস তুই। মা, আমি তো কোনও ঐতিহাসিক নই, তাই হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। কিন্তু তোদের একটা কথায় আমি একমত, যথাসম্ভব চট্‌জলদি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। একদল বিদেশীর লেখা তথ্যকে অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের কচিকাচারা জাতীয় গৌরব সম্পর্কে জানতেই পারছে না। ভারতবর্ষের জাতীয় বীর, বীরত্বের ইতিহাস, গৌরবময় অধ্যায়গুলি বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা তো দূরের কথা, লুকিয়ে রাখা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, আমরা আর্যরা বাইরে থেকে এদেশে এসেছি, ফলে মুসলমান, ইংরাজরা যদি বিদেশী হয়, সেই যুক্তিতে আমরাও বিদেশী। এভাবে তারা আমাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

আমাদের মধ্যে যাতে জাতীয় স্বাভিমান তৈরি না হয় এজন্যই এই পরিকল্পিত প্রচেষ্টা দিনের পর দিন হয়েছিল এবং আজও চলছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। জার্মানীর প্রতিটা ঘরে স্বজনহারানোর কান্না। সেনাদল ভেঙে দেওয়া হয়েছে, অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, তার ওপর মিত্রশক্তিব আর্থিক ক্ষতিপূরণ। খনি অঞ্চলগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, বিমান বাহিনী রাখার অধিকারও তার নেই। তীব্র

বেকার সমস্যা, শত্রু বেমার আঘাতে দেশের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। এছাড়াও রয়েছে জাতীয় অপমানের পীড়া। পাশে নেই কোনও বন্ধু রাষ্ট্র। তা সত্বেও কিভাবে মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই জার্মানী উঠে দাঁড়ায়। কোন মন্ত্রবলে বিশ্ব রাজনীতির গতি-প্রকৃতি ঠিক করে দেওয়ার অধিকার ছিনিয়ে নেয়! এর উত্তর একটাই— জাতীয় স্বাভিমান। এজন্যই একদল ঐতিহাসিকের এই কুপ্রচেষ্টা, যাতে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ, জাতীয় স্বাভিমান কখনও তৈরিই না হয়। তুই লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলি না? পাঠ্য পুস্তকের বয়ান অনুসারে মাত্র ১৮ জন সেনা নিয়ে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ১২০৬ খৃষ্টাব্দে গৌড় রাজ্য আক্রমণ করে নদীয়া জয় করে। ১২৪৩ সালে মিন্‌হাজ-উস্‌-মিরাজ এ ঘটনাটা তার পুস্তকে লেখেন। সেখান থেকে এই তথ্য আমাদের পাঠ্যপুস্তকে ঢোকে। মিন্‌হাজ কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষদর্শী নয়, তিনি ঘটনার ৪০ বছর পর নিজাম্‌উদ্দীন ও সম্‌সাম্‌উদ্দীন নামে দুই ভাইয়ের কাছে এই ঘটনা শোনেন। এখন প্রশ্ন হল, সামান্য দুই জন অশিক্ষিত সেনা কর্মীর দেওয়া তথ্য সূত্র কি গ্রহণযোগ্য, তাও আবার ভারত প্রসিদ্ধ বীর লক্ষ্মণ সেন সম্পর্কে? যিনি মাত্র পনের বছর বয়সে পিতামহের সঙ্গে গৌড় বিজয় অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন। যৌবনে কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। কাশীরাজ যার বিক্রমে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। কামরূপ রাজকে যিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। তৎকালীন উত্তর ভারতের শক্তিকেন্দ্র রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্য কান্যকুব্জ জয় করেন। পুরী, কাশী ও প্রয়াগের বিজয়স্তম্ভ এই বীর বাঙালীর বীরত্বের কাহিনীর সাক্ষ্য বহন করে।

লক্ষ্মণ সেন ছিলেন বাঙলার বিক্রমাদিত্য। তিনি ছিলেন একধারে শ্রেষ্ঠ বীর আবার কবিও। সাহিত্য ও শিল্পে চরম উৎকর্ষ দেখা দেয় তাঁর রাজত্বে। যার বাহুবলে কামরূপ থেকে কনৌজ পর্যন্ত বঙ্গবাহিনী জয় করে। সেই লক্ষ্মণ সেন কিনা মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কাছে পরাজিত হন— এ কোন উপহাস? বর্তমান ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতারা কি অন্য কোনও সূত্র থেকে এই তথ্য যাচাই করেছেন? উত্তর— না। আবার এই নদীয়া কোথায়? ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বাঙলার ইতিহাস' গ্রন্থেও এই প্রশ্ন তুলেছেন। তার কথায়, নদীয়া যদি নবদ্বীপ হয় তবে বখ্‌তিয়ার সেন রাজ্যের কোনও সামন্তকে পরাজিত করলেও করতে পারেন। আবার মগধ থেকে সামান্য কিছু সেনা নিয়ে কি বাড়বঙ্গ বা বঙ্গ দেশ লুণ্ঠন সম্ভব? আবার তিনি রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ না করে নদীয়া আক্রমণ করবেন কেন? ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনাদলের পক্ষে অতিক্রম করা কি সম্ভব? আবার সত্যিই যদি নদীয়া বখ্‌তিয়ার কৃত অধিকৃত হয়, তবে ঘটনার অর্ধশতাব্দী পরে সুলতান যুগীস্‌উদ্দীন যুজবক্‌ আবার কেন নদীয়া আক্রমণ করেন এবং বিজয় উপলক্ষে নতুন মুদ্রা তৈরী করেন? অর্থাৎ বখ্‌তিয়ারের নদীয়া বিজয় কাহিনী অলীক। মিন্‌হাজ স্বয়ং স্বীকার করেছেন, গৌড় বিজয়ের পরেও সেন বংশ বঙ্গদেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কেন

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি মানা হয় না? শুধু যাতে আমাদের জাতীয় স্বাভিমান না জাগে, তাই এই প্রচেষ্টা! তাই ইতিহাসের বিকৃতি! অনেক রাত হল, এবার লেখা বন্ধ করছি। ভালো থাকিস।

ইতি— মা,

রামায়ণ মহাভারতের যুগে বাঙালী

প্রিয় ধৃতি,

কেমন আছিস মা! আমরা এখানে সকলে ভালো আছি। আমরা কালকেই বিয়েবাড়ী থেকে ফিরলাম। তোকে সবাই মিস করছিল। তোর ছোট ভাই বোনেরা তো ধৃতি দিদির কথা জিজ্ঞাসা করে করে কান ঝালাপালা করে দিয়েছে আমার। তোর নতুন বৌদিও তোর কথা খুব বলছিল। বোধহয় বাবুসোনা তাকে তোর কথা বলেছে। অনেকদিন পর তোর ঝুনুদি, মিষ্টি পিসি, মণি পিসিদের সঙ্গে দেখা হল। তোর নিনি কাকা সাতদিন আগেই মুম্বাই থেকে ফিরে এসেছে বিয়ে উপলক্ষে। যাক, ভালোভাবেই বিয়ে কেটেছে। অষ্টমঙ্গলার আগের দিন তোর রাঙা পিসি, নতুন বৌ ও বাবুসোনাকে নিয়ে আমাদের বাড়ি গিয়েছিল মা কালীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। মামার বাড়ি নাকি বৌমার খুব পছন্দ হয়েছে। এটা তো বলাই হয়নি, তোর নতুন বৌদির নাম পুনম। বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরেই তোর চিঠি পেলাম। আমরা বেরোনোর পরের দিনই চিঠিটা এসেছে। তুই এই চিঠিতে বাঙালীর প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিস। তোর চিঠি পড়ে বুঝতে পারলাম, আসলে তুই প্রাচীনকালে বাঙালী বীরদের কথা জানতে চেয়েছিস। তবে বলি, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসভিত্তিক দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে বাঙালী বীরদের কীর্তি লেখা রয়েছে। বাঙালী বীর কৃষ্ণের মথুরা আক্রমণ করেছে, দ্বারকা অবরোধ করেছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছে। শ্রীরামের পিতৃপুরুষ রঘু রাজার সঙ্গে নৌযুদ্ধ করেছে। সাগর রাজের যজ্ঞাশ্ব আটক করেছে, আর কত বলব! হরিবংশ, পুরাণগুলিতেও বাঙালীর বীরত্বের ভুরি ভুরি প্রশংসা রয়েছে। মোদ্দা কথা, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একথা স্পষ্ট। ভালই হোক আর খারাপই হোক, বাঙালী কখনও দুর্বল ছিল না বরং দুর্ধর্ষ ছিল। বিখ্যাত 'গীতা' টীকা গ্রন্থের লেখক জগদীশচন্দ্র ঘোষের ভাষায়, "বাঙালীরা প্রাচীনকাল হইতেই শৌর্যবীর্যের অধিকারী ছিল। বাঙলার মাটিতে, বাঙলার জলবায়ুতে কখনই কাপুরুষের সৃষ্টি হয় নাই। ইহাদের দুর্দশার কারণ শক্তিমত্তার অভাব নহে, একতার অভাব, জাতীয়তার অভাব।"

প্রাচীনকালের বঙ্গরাজ্য অবিভক্ত বাংলার একাংশ মাত্র। এটা ছিল অবিভক্ত বাংলার মধ্যভাগে অবস্থিত। বঙ্গরাজ্যের পূর্বে ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য। বর্তমান চট্টগ্রাম, ঢাকা সংলগ্ন কিছু অংশ ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পৌণ্ড্র রাজ্য ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে। সমগ্র রাজশাহী অঞ্চল এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজ্যের উত্তরে কিরাত রাজ্য ও পশ্চিমে ছিল অঙ্গরাজ্য। দক্ষিণ পশ্চিমে ছিল— সুহ্ম রাজ্য। বর্তমানের বর্ধমান বিভাগ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর একেবারে দক্ষিণে ছিল তাম্রলিপ্ত রাজ্য। পরবর্তীকালে এই রাজ্যগুলি অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীন হয়ে গৌড়বঙ্গ বা গৌড় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। আরও পরবর্তীতে বঙ্গ থেকে বাংলা নামে এই রাজ্য অভিহিত হয়। ঐতরেয় আরণ্যকেও বঙ্গদেশের উল্লেখ রয়েছে। পুরাণ থেকে জানা যায়, বলি রাজার পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড ও সুহ্ম এ অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ নামে এই পাঁচটি রাজ্য স্থাপনা করেন। এ তো গেল বাঙালীর, বাঙালী জাতির প্রাচীনত্বের কথা। প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলের কথা। এবার আসি অস্ত্র হাতে বাঙালী বীরের কথায়। সে অনেক আগের কথা। শ্রীরামের পিতৃপুরুষ রাজা রঘু দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। সমস্ত দেশ জয় করে বাঙলায় আসলে বঙ্গীয় সেনা তাঁকে প্রতিরোধ করে। সেখানেই প্রথম আমরা বাঙালীর নৌ-বাহিনীর পরিচয় পাই। কবি গেয়েছেন—

আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে।
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।।।

শ্রীকৃষ্ণ যখন মল্লযুদ্ধে মথুরা নরেশ কংসকে বধ করে উগ্রসেনকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন, তখন মগধরাজ জরাসন্ধের সঙ্গে মিলিত হয়ে পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও বঙ্গাধিপও মথুরা আক্রমণ করেন। সেই সৈন্যদলে কারা ছিল? বর্তমান দুই বাংলার নিবাসী বাঙালী সেনা। তবে কেন বলা হবে বাঙালী অসামরিক জাতি, যুদ্ধবিদ্যায় বাঙালী পারদর্শী নয়?

মাতৃভূমি অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য রক্ত নিতে ও দিতে বাঙালী কখনও পিছপা হয়নি, আর হবেও না। তাদের মন থেকে অসামরিক জাতি, যুদ্ধ করতে না জানা জাতির অপপ্রচার মুছে দিতে হবে। আমাদের গলা ফাটিয়ে বলতে হবে, আমরা বীর, বীর রক্ত আমাদের শিরায় বইছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

"বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি
কি শিখানু তা'রে?"

যে বাংলা এক সময় সারা ভারতবর্ষকে পথ দেখাত, সেই বাংলা নিজেকেই অখণ্ড রাখতে পারল না, ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখতে পারল না। মহারাজা শশাঙ্ক, বিজয় সেনানী, দিগ্বিজয়ী ধর্মপাল, রাজা গণেশ, প্রতাপাদিত্য, বীর চিলারায়ের বংশধর দুর্বল, কাপুরুষ এও কি কখনো সম্ভব! ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, যতীন, সত্যেন, মাস্টারদা, সুভাষ,

প্রীতিলতা কি কখনও দেশের জন্য প্রাণ দিতে ভয় পেয়েছেন? এই সেদিন পাকিস্তানী বাহিনী ইসলামী দস্যু রাজকারদের হটিয়ে 'বাঙ্গালী' মুক্তিবাহিনী কি পৃথিবীর ভূগোল বদলে দেয়নি! এর জন্য কি ভারতবাসী কম ত্যাগ স্বীকার করেছে?

অনেক রাত হল রে। তাহলে আজকের মতো শেষ করছি! ভালো থাকিস মা!

ইতি— মা

বীর সাধক শ্রীচৈতন্য

স্নেহের ধৃতি,

কেমন আছিস মা! আজ তোর একটা নানা রঙে রাঙানো চিঠি পেলাম। আমার মেয়ে যে এত ভালো আঁকতে পারে তা তো জানতাম না। চিঠিটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন নানা রঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কাল তোর দিদার সঙ্গে কথা হল। শুনলাম তুই নাকি ফোন করে জমিয়ে গল্প করেছিস। এবার বেশ বুঝতে পারছি, মেয়ে আমার বড় হয়েছে। ছোট ভাই-বোনদের মাধ্যমিক পরীক্ষার পর খবর নিচ্ছিস। বুড়ো দাদুর ওষুধ নিয়মিত না খেলেই তাকেও বকুনি দিচ্ছিস, ঠাকুমা-দিদার সঙ্গে চুটিয়ে গল্প চালাচ্ছিস। তোর দাদু তো তোর ভয়ে এখন একদিনও ওষুধ খেতে ভোলে না। এতে তোর ঠাকুমার চিন্তা অনেকটাই কমেছে। সেদিন খেতে বসে মা কি বলে জানিস! বৌমা আগে যদি জানতুম, সতীন থাকলে এত চিন্তামুক্ত থাকা যায়, তবে আগেই তাকে আনতুম।

ভালো মা। এটাই তো চাই। জীবনে ব্যস্ততা তো থাকবেই। এর মধ্যেই প্রিয়জনদের জন্য একটু সময় বের করতে পারলে তবেই তো জীবনের স্বার্থকতা। শিল্পী নন্দলাল বসু অনুকরণে চৈতন্য মহাপ্রভুর ছবিটি দারুণ হয়েছে। তোর দাদু তো তাকে বড় করে বাঁধাবে বলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আজ তোর চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা বলি। এই দোল পূর্ণিমার দিনই বর্তমান নদীয়া জেলার নবদ্বীপে তাঁর জন্ম। তারিখটা ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৪৮৬। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচী দেবী। চৈতন্যদেবের পূর্বনাম বিশ্বম্ভর, ডাকনাম নিমাই। ছোটবেলায় নিমাই যেমন দুরন্ত ছিল তেমনি ছিল মেধাবী। অল্প বয়সেই তিনি টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করেন। তেইশ বছর বয়সে পিতার পিণ্ডদান করতে গয়ায় গিয়ে তাঁর ভাবান্তর হয়। হরি ভক্তিতে বিভোর হয়ে পড়েন। বাড়ি ফিরে তিনি বন্ধুদের নিয়ে হরিনাম সঙ্কীর্তন শুরু করেন। জাত-পাতের বাধা ভেঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে সকলে একযোগে নগর সংকীর্তন শুরু করে। বাংলার হিন্দু সমাজে আসে এক নবজাগরণ। যেন ঘুমন্ত সিংহ নাড়া দিয়ে উঠছে। শ্রীচৈতন্য সকলকে বলেন, 'শ্রীকৃষ্ণই

একমাত্র ঈশ্বর ও আরাধ্য, তিনি প্রেমময়, তাকে লাভ করতে হলে তিনি যে ঈশ্বর সেকথা ভুলে তাকে ভালোবাসতে হবে।' তিনিই প্রথম গণআন্দোলন শুরু করেন। কৃষ্ণভক্তির আন্দোলন। তার কাছে কৃষ্ণভক্ত মানেই পূজ্য। সেখানে না আছে জাতের বিচার, না সম্প্রদায়ের। শুনলে অবাক হবি, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য কিন্তু দুর্বল ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক মস্ত বীর। কিন্তু বর্তমানে তার পৌরুষ, তাঁর বীরতা, তাঁর দৃঢ়তা মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেছে। বাঙালী হারিয়েছে এক বীর সন্তানের বীরত্বের ইতিহাস। তোকে আজ সেই গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলি।

বাংলায় গৌড় সিংহাসনে তখন সুলতান হোসেন শাহ। যদিও অনেকে তাকে প্রজাপালক রাজা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের আসানে বসাতে ব্যস্ত। কিন্তু সত্য কথা হল, অন্যান্য মুসলমান রাজাদের থেকে তার আচরণ কিছু ভিন্ন ছিল না। বিজয় গুপ্ত তার মনসামঙ্গল কাব্যের তৎকালীন হিন্দুর প্রতি মুসলমান কর্মচারীর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা করে লিখেছেন—

"যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ।।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল।
পাথরের প্রমাণ যেন ঝড়ে পড়ে শিল।।"

তিনি লিখেছেন—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুতু দেয় মুখে।।"

কবি ভারতচন্দ্র অন্নাদামঙ্গলে মুসলমান শাসকের গুপ্ত বাসনা লিখতে গিয়ে লেখেন—

"আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই।।"

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপের মুসলমান কাজী কৃষ্ণনাম কীর্তন নিষিদ্ধ করলেন। বৃন্দাবনদাস কাজীর অত্যাচার সম্পর্কে চৈতন্যভাগবতে লেখেন—

"যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে।।
কাজী বলে হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া।।"

অত্যাচারের ভয়ে অনেকে নবদ্বীপ ছাড়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু প্রেমাবতার চৈতন্য দৃঢ়কণ্ঠে বলেন—

"ভাঙ্গিব কাজীর ঘর কাজীর দুয়ারে।

কীর্তন করিব দেখি কোন কর্ম করে।।"

শ্রীচৈতন্য কীর্তনীয়ার দল নিয়ে কাজীর বাড়ির দিকে চললেন। কাজী সুলতানী সেনা সহ বাধা দিতে এগিয়ে এল। এবার শ্রীচৈতন্য যোদ্ধার মতো কাজীকে সমূলে ধ্বংস করার হুঙ্কার ছাড়েন। তার সমসাময়িক চৈতন্য-চরিতকার বৃন্দাবনদাস এই ঘটনাকে তার চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেছেন—

"ক্রোধে বলে প্রভু, 'আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়ে কাটিয়া ফেলোঁ মাথা।।
প্রাণ লয়ে কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ' প্রভু বলে বারবার।।
প্রভু বলে অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর।।
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে।"

বিশাল জনসমুদ্রের মার মার কাট কাট শব্দ শুনে কাজী সসৈন্য পালায়। সংকীর্তন নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। কাজী, সুলতান দুই-ই শ্রীচৈতন্যের সামনে মাথা নোয়ায়। এই দৃষ্টান্ত বাঙালী হিন্দুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়। এবার থেকে স্বধর্ম, দেবমূর্তি রক্ষার্থে হিন্দু প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে এল। বাঙালীর ক্ষাত্র তেজ যেন শত সূর্যের ন্যায় জ্বলে উঠল।

"বক্ষে রাখিল ঠাকুর তবু না ছাড়িল।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ডমোগলে কাটিল।।"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, শ্রীচৈতন্যের এই পৌরুষের আদর্শ বাঙালী মনে রাখল না। বাঙালী দাস্য ও মাধুর্য ভাবেই বিভোর হল, পৌরুষকে মর্যাদা দিতে ভুলে গেল। দাস্যভাব ও প্রেমাভাবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হোক আর মুসলমান রাজার ভয়েই হোক, চৈতন্য-চরিতকার বৃন্দাবনদাসের পরবর্তী অন্যান্য চৈতন্য চরিতকাররা এই বীরত্বময় ঘটনাকে প্রাধান্য দেয়নি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তিনি কাউকে ভয় করতেন না। কিন্তু মুরারি গুপ্ত ছিলেন গৃহী। হয়ত তাই রাজকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই ঘটনার বিন্দুমাত্র উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে তিনি করেন নাই। যদিও বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, কাজীর ঘর ভাঙ্গার ব্যাপারে মুরারি গুপ্তও সক্রিয় অংশ নেয়। পরবর্তী চৈতন্য-চরিতকার কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন এই ঘটনা বিবৃত করেননি। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক জয়ানন্দ অবশ্য দুই ছত্রে কাজীর ঘর ভাঙ্গা ও পলায়নের উল্লেখ করেছেন। এই ঘটনার প্রায় একশত বর্ষ পর কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করেন।

সেখানে অবশ্য তিনি এই ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দেন। কিন্তু তিনি বলেন, শ্রীচৈতন্য কাজীর ঘর ভাঙ্গার আদেশ দেন নাই, তিনি কীর্তনের অনুমতি ভিক্ষা করেছেন মাত্র। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে দীনদাস্য ভাবের মহিমা পৌরুষের স্থান অধিকার করিয়াছিল। তাই সমসাময়িক বৃন্দাবনদাস ও শতবর্ষ পরের কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচিত চৈতন্যের জীবনীতে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে— বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য চরিতামৃত বেশি প্রামাণিক। কারণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রথমতঃ একশত বছর পর চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন, দ্বিতীয়ত তিনিও বৃন্দাবনদাসের মতকে গ্রহণ করে লিখেছেন—

"বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্য মঙ্গলে।
বিস্তারি বলিয়াছেন প্রভু কৃপাবলে।"

শ্রীচৈতন্য বাঙলায় ধর্মান্তরের গতিকেও রুখে দিয়েছিলেন। হোসেন শাহ যখন 'কায়োয়ার পানি তার মুখে দেয়াইলা' হিন্দু সুবুদ্ধি রায়ের ধর্ম নষ্ট করেন তখন চৈতন্য 'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন' বলে তার হিন্দু ধর্মে ফেরার পথ করে দেন। বহু ধর্মান্তরিত মুসলমান হিন্দু ধর্মে ফিরে আসে।

এমন হিন্দু বীরের কথা কি বাঙালী ভুলে যাবে! বাঙালী কি শুধু কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে ভাবাবেগে সংজ্ঞাহীন ভুলুণ্ঠিত ধুলিধূসরিত দেহের শ্রীচৈতন্যকেই মনে রাখবে! দুরাচারী মুসলমানকে শাস্তি দিবার জন্য যিনি সদলবলে অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন, "নির্যবন করো আজি সকল ভুবন"। বাঙালীর ঘরে ঘরে আজ সেই সাহসী বীর, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যকে পৌঁছে দিতে হবে। তবেই বাঙালী ফিরে পাবে তার বিজয় সিংহাসন। আজ এখানেই শেষ করছি—।

ভালো থাকিস মা।

ইতি— মা

রায়বাঘিনী ভবশঙ্করী

প্রিয় ধৃতি,

আশাকরি রাধামাধবের আশিসে ভালোই আছিস। আমরা সবাই ভালো আছি। আমার শরীর মাঝে একটু খারাপ হয়েছিল, এখন একেবারে সুস্থ। তোর ঠাম্‌মা যেভাবে আমাকে আগলে রেখেছিল, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমার অসুখের কথা তোকে বলা হয়নি বলে রাগ করিস না মা। অত দূরে তুই আবার দুশ্চিন্তা করবি, তাই তখন

জানাইনি। আর বোকার মতো মায়ের সামান্য অসুখ হয়েছে শুনে ছুটে এলে কি চলবে! তোকে দেশমাতৃকার জন্য লড়তে হবে না! এর জন্য চাই আত্মবিশ্বাস, স্বাভিমান ও অনুশীলন। আমি বা তোর বাবা কেউ চাইনি তোর এই অনুশীলনে কোনও বাধা আসুক। তুই প্রস্তুত হ' মা। কাল তুই ফোনে কাঁদছিলি কেন? বীর মেয়ে কখনও কাঁদে? বাংলার বীর সন্তান, সদা বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। দুঃখের বিষয়, সেগুলি পাঠ্যপুস্তক গুলিতে তো স্থান পায়ই-নি, কোনও লেখকের হাত ধরে লিপিবদ্ধও হয়নি। হ্যাঁ, বিকৃত নিশ্চয়ই হয়েছে। আজও আমাদের বাঙলায় স্বাভিমানী প্রকৃতির নারীকে নিন্দাচ্ছলে 'রায়বাঘিনী' বলা হয়। কিন্তু একদিন এই মহীয়সী মহিলার শৌর্য-বীর্য বাংলা-ওড়িশার পাঠান শাসকদের হতাশ করেছিল। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগের ঘটনা। পেঁড়োর গড়ের দুর্গাপতির এক প্রধান সামন্ত দীননাথের ঘরে জন্ম নেয় এক সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। দীননাথ তার নাম রাখেন ভবশঙ্করী। খুব অল্প বয়সেই ভবশঙ্করী মাতৃহারা হয়। দীননাথ মেয়েকে কখনোই একা ছাড়তেন না। ধীরে ধীরে মেয়ে বড় হতে থাকে। ভবশঙ্করী সর্বদা বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পুতুল খেলার চেয়ে তলোয়ার, বর্শা চালানো, তীর-ধনুক ছোঁড়ার মতো সামরিক ক্রীড়া-কৌশলই ভবশঙ্করীর কাছে বেশি প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ফলে ভবশঙ্করী হয়ে উঠলেন রণনিপুণা। পেঁড়োর গড় ছিল ভুরসুট (ভুরি শ্রেষ্ঠ) রাজ্যের অন্তর্গত। রাজ্যের যুবা রাজার কানে ভবশঙ্করীর সৌন্দর্য ও বীরত্বের কথা পৌঁছাল। রাজমাতার ইচ্ছায় ভবশঙ্করীর সঙ্গে ভুরসুটরাজ মহারাজ রুদ্রনারায়ণের বিবাহ হয়। রাজধানীতে বেশ সুখেই রাজারাণীর দিন কাটতে থাকে।

রাণী ভবশঙ্করী এক পুত্র সন্তান জন্ম দেন। কিন্তু এই বীর দম্পতির ভাগ্যে দাম্পত্য সুখ বেশিদিন সইল না। কয়েক বছর পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ মারা গেলেন। তখন বঙ্গদেশ যেন এক যুদ্ধ শিবির। পাঠান সর্দার দায়ুদ খাঁ ও কতলু খাঁ মোগলদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে নিজেদের প্রাধান্য বাঁচাতে। এদিকে সময় বুঝে রুদ্রনারায়ণও বাংলায় মুসলমান অত্যাচার বন্ধের জন্য মোগল সেনাপতি হিন্দু মান সিং-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু রাজার মৃত্যুতে রাজ্য হল অভিভাবকশূন্য। রাণী শোকে কাতর হয়ে সতত পূজার্চনায় রত। এমনকি রাণী ভবশঙ্করী রাজমহল ছেড়ে কাটশাকড়া শিবমন্দিরে বসবাস শুরু করেন। একদিন সুযোগ বুঝে কয়েকজন সহকর্মী সহ পাঠান সেনাপতি ওসমান সন্ন্যাসী বেশে মন্দির আক্রমণ করে। কিন্তু রাণীর বীর মূর্তি ও সশস্ত্র অঙ্গরক্ষিণীদের দেখে রণে ভঙ্গ দেয়।

ওসমান এবার খোলাখুলি রাণীর রাজ্য আক্রমণে এগিয়ে আসে। গুপ্তচর মারফৎ রাণী আগেই এ খবর পেয়ে যান। রাণীও নিজ সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুত হতে বলেন। তিনি কখনও ঘোড়ায় চড়ে কখনও হাতিতে চড়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করে তোলেন। এদিকে পাঠানরা ধরেই নিয়েছিল, তারা বিনা বাধায় রাজ্য জয় করবে। সুতরাং তাদের প্রস্তুতি ছিল অনেকটাই ঢিলেঢালা। পাঠান সেনাকে আসতে দেখে রানীর সেনা হর হর

মহাদেব-এর রণহুঙ্কার দেন। সেই সঙ্গে ঝলসে ওঠে শত শত বন্দুকের নল। ওসমান অবাক হল। পাঠান সেনাও প্রাথমিক ঝট্‌কা কাটিয়ে উঠে আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে রাণীর সেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ওসমানের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দেয়। প্রাণ বাঁচাতে যে যে দিকে পারে সেদিকেই ছুটল। বহু মুসলমান সেনা প্রাণ হারায়। তাও ওসমান শেষ চেষ্টা চালায়। কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফলে গেল। যখন ওসমানের ঘোড়াটাও মারা পড়ল, তখন আশা ছেড়ে ওসমান ফকির বেশে বাংলা ছেড়ে ওড়িশায় পালায়। সেদিনের সেই পাঠানের রক্তে রাঙা যুদ্ধভূমি আজও 'রায়বাঘিনীর পাড়া' নামে পরিচিত। তারকেশ্বরের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে এই স্থান। লোকমুখে শোনা যায়, এই যুদ্ধ জয়ের পর মানুষ রাণীকে 'রায় বাঘিনী' নামে সম্বোধন করা শুরু করে। মোগল বাদশা আকবরও নাকি রাণীর দরবারে বহু মাণিক্য সহ অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছিল তার বীরত্বের কথা শুনে। এমনই বীরাঙ্গনার রক্ত আমাদের শরীরে প্রবাহমান। তবেই তো নির্দ্বিধায় মাতঙ্গিনী পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দিয়েছেন। পনের-ষোল বছরের যুবতীরা ইংরাজদের ঘুম ছুটিয়েছে। তোরা হচ্ছিস সেই পরম্পরারই এক নবীন শৃঙ্খল। তোদের চোখে কি জল মানায়! বন্ধুদের আমার ভালোবাসা দিস। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করিস।

ইতি— মা

বঙ্গরাজ শশাঙ্ক

স্নেহের ধৃতি,

কেমন আছিস রে! প্রায় একমাস যাবত তোর কোনও চিঠি পাইনি। এখন তো ফোনও কম করিস। বুঝি বা কাজের চাপ নিশ্চয় খুব বেশি না হলে কি তুই আমাদের একটা খবর না নিয়ে থাকতে পারিস। কিন্তু কি করব বল মা, সারাদিন তো তোর একটা ফোন একটা চিঠির জন্যই চাতক পাখির মতো বসে থাকি। আর শুধু কি আমি একা, তোর বাবা, দাদু, ঠাম্মা— সবার এক জিজ্ঞাসা, তোর কোনও ফোন বা চিঠি আজ এল কিনা। যাই হোক, এদিকের চিন্তা করতে হবে না তোকে। মন দিয় প্রশিক্ষণ শেষ কর। গতকাল তোর বড়দা এসেছিল। ছেলেটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রে। চাকরির পরীক্ষাগুলিতে একের পর এক ব্যর্থতা তার আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরিয়েছে। একদিকে রাজ্য সরকারি চাকরির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া, অন্যদিকে সরকারের কর্মী সংকোচন নীতি। এই দুয়ের যাঁতাকলে পিষে তোর বড়দার মতো লক্ষ লক্ষ যুবক আজ দিশাহারা। এর উপর সরকারের লক্ষ লক্ষ কর্মী নিয়োগের মিথ্যা দাবি বেকার যুবক-যুবতীদের কাটা ঘায়ে লবন

ছিটিয়ে দিচ্ছে। তোর বড়দা হতাশ হয়ে সেদিন বলেই ফেলল, 'কাকিমা, আমার দ্বারা কি কিছু হবে!' আত্মবিশ্বাস প্রতিভায় ভরপুর একটি যুবকের এই হতশ্রী দশা আমার বুকটা ফাটিয়ে দেয়। আমি তার হাত ধরে বলি, 'তুমি কোন বংশের ছেলে বাবা, তোমার মুখে কি এ কথা মানায়! তোমার নাম শশাঙ্ক। যে শশাঙ্ক একদিন ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন। যে বীর বাঙ্গালীর দাপটে সম্পূর্ণ আর্যাবর্ত একদিন বঙ্গপতির সামনে নতমস্তকে দাঁড়িয়েছিল তার বংশধররা ছোটখাটো একটা দুটো পরাজয়ের গ্লানিকে ভাগ্যের লেখা বলে মেনে নেবে? শশাঙ্ক ৬০৬ খৃষ্টাব্দের গৌড়ের সিংহাসনে আরোহন করেন। তার প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। অনেকে তাকে গুপ্ত সম্রাটদের সামন্ত মনে করে, আবার অনেকে তাকে পূর্ববর্তী গৌড়রাজ জয়নাগের উত্তরাধীকারী বলে থাকে। সে যাই হোক না কেন, একথা সত্যি তিনি শুধু নিজ বাহুবল ও সাহসকে সম্বল করে তৎকালীন উত্তর ভারতের সর্বোত্তম রাষ্ট্রগুলির সমবেত শক্তির (কনৌজ, থানেশ্বর, কামরূপ মৈত্রী) বিরুদ্ধে সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। তার রাজধানী ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণতে। সিংহাসনে বসে প্রথমেই তিনি অখণ্ড বাংলা জয় করার সংকল্প করেন। সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে মগধ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই শশাঙ্ক এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা করেন নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস ও বাহুবলের দ্বারা। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলেন, 'শশাঙ্কের পূর্বে আর কোনও বাঙ্গালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা নেই।' সমগ্র বাংলা, বিহার ও ওড়িশার বেশিরভাগ অংশে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করে তিনি উত্তর ভারতের শক্তিশালী মৌখরীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ইতিমধ্যে মৌখরী ও থানেশ্বরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, ফলে মালব রাজ দেবগুপ্ত শশাঙ্কের সঙ্গে জোট বাঁধেন। শশাঙ্কের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আক্রমণাত্মক মনোভাবে আতঙ্কিত কামরূপরাজ মৌখরী-থানেশ্বর মৈত্রী জোটে যোগ দেয়। শশাঙ্ক বারানসী জয় করে আরও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হলে শশাঙ্কের মিত্র মালবরাজ সসৈন্যে মৌখরীদের রাজধানী কনৌজ আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে মৌখরী রাজ পরাজিত ও নিহত হন। এই সংবাদ থানেশ্বরে পৌঁছালে থানেশ্বর রাজ মালবরাজকে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শশাঙ্ক সসৈন্যে বন্ধু মালবরাজকে সাহায্য করতে পৌঁছে যান। থানেশ্বর রাজ শশাঙ্কের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। থানেশ্বর রাজ রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজা হন হর্ষবর্ধন। তিনি কাল বিলম্ব না করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি। গঞ্জামের একটি তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক ৬৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলায় এক সার্বভৌম সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন ও বাঙ্গালীর নেতৃত্বে অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

পরবর্তীকালে যাকে বাস্তব রূপ দেন মহারাজ দেবপাল। পাল রাজাদের অখণ্ড ভারত গড়ার সুদীর্ঘ সংগ্রাম, যা পরবর্তীকালের বাংলার জাতীয় ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবান্বিত করেছে, তার প্রথম সূচনা শশাঙ্কই করেন। তিনিই প্রথম বাংলাকে উত্তর ভারতের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বীরের বীরত্বের ইতিহাস আজও আমাদের অজানা। ও হ্যাঁ, তোদের লাইব্রেরীতে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস' বইটা আছে নিশ্চয়। সময় পেলে পড়বি। এরকম বহু বীরত্বের ইতিহাস জানতে পারবি। আজ তবে ছাড়ছি। ভালো থাকিস মা।

ইতি— মা

ভারতজুড়ে বাঙালীর রাজ্য স্থাপন

স্নেহের ধৃতি,

আজ সকালেই ফিরলাম। ট্রেনটা প্রায় ঘন্টাখানেক দেরিতে হাওড়া পৌঁছালো। যাই হোক, এবারের সফরটা খুব ভালো হয়েছে। তোর পিসি পিসেমশায় তো খুব মজা করেছে। শুধু সবাই তোকে প্রতিক্ষণ মিস্ করছিলাম। দাদু-ঠাম্মা বড়দার বাড়ি থেকে এখনও ফেরেনি। একবার যখন বাবা-মাকে কাছে পেয়েছে তখন আর মাস দুয়েকের আগে তার জিম্মা ছাড়বে নাকি। জানিস, কন্যাকুমারী থেকে চেন্নাই আসার পথে দারুণ এক ঘটনা ঘটেছে। সাত তাড়াতাড়ি তোকে সেই ঘটনা জানাতেই এই চিঠি। আমরা চারজন যখন কন্যাকুমারী থেকে ট্রেনে উঠলাম, তখন দেখি ট্রেনের বাকি দুটো সিটে কেউ আসেনি। প্রায় ট্রেন ছাড়ার মুখে হুড়মুড় করে এক দম্পতি একটি বাচ্চা কোলে এসে বসলেন। তোর বাবাকে তো জানিস, ট্রেনে অপরিচিত কারও সঙ্গে একদণ্ড কথা বলা তার কোনওকালেই ধাতে সয় না। ফলে আমি ও তোর পিসি সরে ওদের জায়গা করে দিলাম। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, বাচ্চাটা এই তিন-চার বছরের হবে। তুই বিশ্বাস করবি না, অবিকল তোর মতো ওর রং ও চেহারা। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হল, ওরা হিন্দির মতনই কোনও ভাষায় কথা বলছে। আমরাও নিজেদের মধ্যে গল্প করে চলেছি। ইতিমধ্যে বাচ্চাটা জানলার কাছে বসবে বলে আমার কোলে উঠে আসে। তখন আর না কথা বলে থাকি কি করে। কথা বলে জানতে পারি, ভদ্রলোকের নাম রবীন্দ্রর সিং। তার স্ত্রীর নাম মনপ্রীত। ওরা পাঞ্জাবের বাসিন্দা। স্বামী-স্ত্রী দুজনই কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বাচ্চাটির নাম দেবশ্রী। একদম একশ শতাংশ খাঁটি বাঙ্গালী নাম। আমরা বাংলার লোক ও বাঙ্গালী শুনে ওদের সে কি আনন্দ! কথায় কথায় ওরা জানালো, ওদের পূর্বপরুষও নাকি বাঙ্গালী। এবার

তোর বাবা উৎসাহের সঙ্গে বলে, "আপনারা কয় পুরুষের প্রবাসী!" উত্তর শুনে আমাদের মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়। রবীন্দ্ররবাবুর পরিবার নাকি আজ থেকে প্রায় তেরশ বছর আগে বাংলা ছাড়ে অর্থাৎ সেই সপ্তম শতাব্দীতে। আর এই ঘটনা তারা তাদের পূর্বপরুষদের মুখে মুখে শুনে এসেছে। এই বাঙ্গালী পরিচয়কে ধরে রাখতেই নাকি মেয়ের নাম রেখেছে দেবশ্রী। আমার ও তোর পিসির যা হিন্দি, তাতেই টেনেটুনে ভালোই চলছিল। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভালো বাংলা না জানলেও অনেক বাংলা শব্দই জানে। আরও আশ্চর্যের কথা, তারা নাকি 'বাঙ্গালীর বাংলার বাইরে রাজ্য স্থাপন' এই বিষয় নিয়ে রীতিমত গবেষণা চালাচ্ছে এবং সেই সূত্রেই তাদের তামিলনাড়ু ভ্রমণ। ওদের গবেষণার সূত্র ধরে তারা জানায়, গদাধর নামে এক বরেন্দ্রনিবাসী, বর্তমান মালদা-দিনাজপুর অঞ্চলের মানুষ একসময় চেন্নাইয়ের কাছে কোলগোল্লুগ্রামে একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। নিজের বিষয় বলতে গিয়ে রবীন্দ্ররবাবুর স্ত্রী মনপ্রীত বলে, তাদের পূর্বপুরুষেরা সপ্তম শতাব্দীতে শক্তি নামে এক যোদ্ধার নেতৃত্বে বাংলা থেকে পাঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই বাংলা ছেড়ে যাওয়া শুধু রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে নাকি তার অন্য কোনও কারণ ছিল তা অবশ্য তারা বলতে পারেনি। তারা গবেষণায় জানতে পেরেছে, এই রাজ্যটির রাজধানীর নাম ছিল দর্ভাভিসার। রবীন্দ্ররবাবু আরও কিছু তথ্য জানান যা শুনলে বাঙ্গালীর বুক ফুলতে বাধ্য। ১১৯১ খৃষ্টাব্দের একখানি লিপি থেকে জানা গেছে, গৌড় নিবাসী জনৈক মল্ল একসময় গাড়োয়াল অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তিনি নিজ বাহুবলে কেদারভূমি ও তার নিকটবর্তী অঞ্চল জয় করেছিলেন। আবার মধ্যপ্রদেশের প্রসিদ্ধ চন্দেল রাজাদের এক সেনাপ্রধানও নাকি বাঙ্গালী ছিলেন। এছাড়াও মহাবংশের তথ্য অনুযায়ী শ্রীলঙ্কার বর্তমান সিংহলবাসীরাও আদতে বাঙ্গালী বিজয় সিংহের বংশজ। কথার রেশ ধরে মনপ্রীত বলে, এশিয়া মহাদেশে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারে বাঙালীর কৃতিত্ব কম নয়। ব্রহ্মদেশের প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্য মূলত বাঙ্গালীর সৃষ্টি। যবদ্বীপে প্রাপ্ত কতকগুলি মূর্তিতে উৎকীর্ণ লিপি অনেকটাই বাংলা লিপির মতো। সুমাত্রায় শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজগুরু ছিলেন বাঙ্গালী আচার্য কুমার ঘোষ।

এবার রবীন্দরবাবু বলেন, শশাঙ্কের হাত ধরে একদিন বাঙ্গালী সেনা সারা উত্তর ভারত দাপিয়ে বেড়িয়েছে। বাঙ্গালী বীরদের উপাখ্যান বহু গ্রন্থে আজও সুবর্ণ অক্ষরে লেখা রয়েছে। দরকার শুধু সেগুলিকে এক জায়গায় করার। তার কথায়, মুসলমান আক্রমণে গ্রন্থাগারগুলি ধ্বংসের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙ্গালী। তিনি আরও বলেন, যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীকে বলা হচ্ছে তোমরা ভাত ঘুম দেওয়া ভীতু বাঙ্গালী। একথা সর্বথা অসত্য এবং ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। আমরা একমনে এই অধ্যাপক দম্পতির কথা শুনছি। রবীন্দ্ররবাবু দীপ্তকণ্ঠে বলে ওঠেন, স্বামীজী বলতেন, 'মানুষকে সবসময় তার দুর্বলতার কথা বলা তার দুর্বতলার প্রতিকার নয়, তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াই প্রতিকারের উপায়।' কিন্তু আমাদের দেশে তার উল্টো। মনপ্রীত এবার বলে, আমাদের

সর্বপ্রথম জানতে হবে, আমরা কার সন্তান, কোন রক্ত আমাদের ধমনীতে বইছে। তবে তো আমরা আগে যা ছিল তার চেয়েও উজ্জ্বল ভারত গড়তে পারব। ইতিমধ্যে গাড়ি কি যেন একটা স্টেশনে থামল। দুই দম্পতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নেমে গেল।

তোকে সত্যিই বলছি, আমি যখনই তাদের কথা ভাবি, তখনই কোনও এক ঘোরের মধ্যে চলে যাই। মনে মনেই বলি, এই জন্যই বুঝি ভারতবর্ষ শত আঘাতের পরও বেঁচে আছে। তাই এই ভূমি দেবভূমি, পুণ্যভূমি। ভালো থাকিস মা।

ইতি— মা

ভারতসম্রাট দেবপাল

প্রিয় ধৃতি,

ভালো আছিস তো মা! আমরা সবাই ঈশ্বরের কৃপায় ভালোই আছি। আজ বেলার দিকে তোর একটা চিঠি পেলাম। চিঠি পড়তে গিয়ে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছিলাম না। মেয়ে মাকে চিঠি লিখছে, কোথায় একটু লিখবে কেমন আছো মা, আমি এখানে ভালো আছি। তা না, শুধু শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী রাজা দেবপাল সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। তিনি কোন বংশের রাজা ছিলেন, অখণ্ড ভারত কি তিনি গড়েছিলেন? ইতিহাসের কোথাও এই বীরকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়নি কেন? দেবপাল কি সম্পূর্ণ আর্যাবর্ত জয় করেছিলেন? সুদূর দাক্ষিণাত্যের কোন কোন রাজাকে তিনি পরাজিত করেছিলেন? তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে তো আমার প্রায় যায় যায় অবস্থা। সেই কবে ইতিহাস পড়েছি। এখন কি আর অতশত মনে আছে! কিন্তু তোর বাবা বললেন, যতই হোক মায়ের আদেশ, মানতেই হবে। তাই শুরু করলাম বইপত্র ঘাঁটাঘাটি। টেনে নামালাম আমার কলেজ জীবনের বইপত্র। এই নিয়ে সেদিন বাড়িতে ঘটল এক মজার কাণ্ড। তোর ছোটো কাকু, আমার পুরনো বইয়ের বাছাই দেখে সরস মন্তব্য করে বলে, এ তো দেখছি মশা মারতে কামান দাগা। আর যায় কোথায়, আমার পক্ষে অস্ত্র ধরেন স্বয়ং আমার শাশুড়িমাতা। সন্তানের প্রথম গুরু মা। মা-ই তো সন্তানকে শেখাবে কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান এগুলির সঙ্গে একজন মা-ই তার সন্তানের প্রথম পরিচয় ঘটায়। আর আমার বউমা তাই করছে। সন্তানকে তার তেজস্বী পূর্বপুরুষের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছে। যেদিন মায়েরা এই কাজকে দূরে ঠেলে রান্নাঘরের দিকে বেশি ঢুকেছে সেদিনই ভারতের আকাশে কালো মেঘ ছেয়ে গেছে। সন্তান পালনে পুরুষ মানুষের আর দায় কতটা! এবার রে রে করে মাঠে নামে তোর ঠাকুরদা। একে একে বাড়ি রণক্ষেত্র আর কি! ইতিমধ্যে তোর বাবা-কাকা-দাদু একজোট।

অবশ্য তোর ছোট পিসি আমাদের সেরা অস্ত্র। তোর নতুন ছোট পিসেমশাইও বিতর্কে সমান উৎসাহী। দেখ না, এটাই জীবনের আনন্দময় দিক। জীবনে সুখ-দুঃখ সব সময়ই থাকবে। কিন্তু নিজ আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে থাকার মধ্যে এক বড় শান্তি। সুখ ও শান্তি দুটি অনেকটা একরকম মনে হলেও এক নয় কিন্তু। সুখ থাকলেই জীবনে শান্তি থাকবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু শান্তি থাকলে জীবনে সুখ আসবেই। আরে যা, তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে যে। শোন তবে, পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম দেবপাল। ৮১০ খৃঃ থেকে ৮৫০ খৃঃ— এই দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছেন। দেবপালের তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, তার প্রভুত্ব দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ছড়ানো ছিল। তার মন্ত্রী কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র তার লিপিতে উল্লেখ করেছেন, দেবপাল হলেন হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রভু। এই লিপিতে আরও উল্লেখ আছে, ওই দেবপালই শক্তিশালী হূন জাতির গর্ব খর্ব করেন। রাজা হয়ে প্রথমেই তিনি ওড়িশা ও অসমের দিকে অগ্রসর হন। অসমরাজ বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। ওড়িশা রাজ পরাজিত হন। এরপর তিনি উত্তর ভারতের শক্তিশালী প্রতিহার রাজ ভোজকে পরাজিত করেন। তিনি হিমালয় অঞ্চলের কম্বোজ রাজকেও পরাজিত করেন। গুর্জররাজও দেবপালের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। সম্পূর্ণ পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম ভারত জয় করে তিনি দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। প্রথমে রাষ্ট্রকূট পরে দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজ্য জয় করে বাঙালীর অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেন। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, তাঁর সাম্রাজ্য হিমালয় থেকে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যকেই উত্তর ভারতের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা পাল সাম্রাজ্য অধিক বিস্তৃত ও অধিককাল স্থায়ী ছিল। দেবপালের আমলে বীর বাঙ্গালী সেনা ব্রহ্মপুত্র থেকে সিন্ধুনদ, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। সেসব ভাবলেই যেন স্নায়ুতে নতুন তেজ জন্ম নেয়। আমরা এই বীরদেরই সন্তান। আজ তবে রাখছি। ভালো থাকিস মা।....

ইতি— মা

বাঙালীর বীরত্বে আলেকজান্ডার নত

প্রিয় ধৃতি,

আশা করি ঈশ্বরের করুণায় ভালো আছিস। আমরা সবাই ভালো আছি। আজ সকালে একটা দারুণ ঘটনা ঘটেছে, তাই সাত তাড়াতাড়ি তোকে চিঠি লিখতে বসলাম। বেলা ১২টা নাগাদ আমি রান্না ঘরে ব্যস্ত এমন সময় পেলাম পোস্টম্যানের ডাক। তোর চিঠি ভেবে দিলাম এক ছুট। বেরিয়ে দেখি তোর দাদু পোস্টম্যানের সঙ্গে কথা বলছে। চিঠিটা এসেছে ইউরোপ থেকে। খামে যদিও ঠিকানা আমাদের বাড়ির, কিন্তু ইউরোপ থেকে চিঠি আমাদের কে পাঠাবে এই ভেবে বাবা চিঠিটা নেবেন না। তার এক কথা, হয়ত ঠিকানা লিখতে ভুল হয়েছে। কিন্তু ঠিকানাতে তো তোর বাবারই নাম রয়েছে, তাই পোস্টম্যানও নাছোড়। শেষে আমি গিয়ে দেখি, প্রেরক রবীন্দ্রর সিং। মনে পড়ে গত চিঠিতে কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপক দম্পতির কথা জানিয়েছিলাম, সেই ভদ্রলোকের চিঠি। কিছুটা আশ্চর্য, কিছুটা ঘোরের মধ্যেই চিঠিটা খুললাম। বৌদি সম্বোধন করে চিঠি শুরু করেছেন ভদ্রলোক। যদিও চিঠির শেষে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই নাম লেখা। অধ্যাপক দম্পতি বাংলার বাইরে বাঙ্গালীর রাজ্য স্থাপন-এর গবেষণা সূত্রে বর্তমানে ইউরোপে রয়েছেন। সেখানে বীর বাঙ্গালী সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য পেয়েছেন যা নাকি বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাসে স্বর্ণময় অধ্যায়। তথ্যগুলি আমাকেও অবাক ও গর্বিত করল। ভদ্রলোক লিখেছেন, 'আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে (খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে) ভারতবর্ষের একটি পরাক্রান্ত জাতির কথা সমসাময়িক গ্রীক লেখকরা উল্লেখ করেছেন। তাদের ভাষায় ওই জাতির নাম গঙ্গরিতই অথবা গণ্ডারিতাই। গ্রীক লেখকরা অবশ্য এই রাজ্যের যথার্থ বিস্তৃতি সম্পর্কে ধোঁয়াশা রেখেছেন। কারো মতে গঙ্গানদী এই রাজ্যের পূর্ব সীমানা, আবার অন্য কেউ পশ্চিম সীমানা বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই জাতি যে বাংলার অধিবাসী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সমকালীন গ্রীক লেখক ভিওতোরাস-এর ভাষায় 'গঙ্গরিতই জাতি হল ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। চার সহস্র রণহস্তী রয়েছে এই দেশের সেনা দলে। ফলে অপর কোনও দেশ এই দেশ জয় করতে পারেনি। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই বিশাল সেনার কথা শুনে এই জাতিকে পরাজিত করার দুরাশা ত্যাগ করেন। গ্রীক গ্রন্থকাররা গঙ্গরিতই ছাড়াও আরও একটি জাতির উল্লেখ করেছে, যার নাম প্রাসিয়য়। গ্রীক ভূগোলবিদ টলেমির মতে, প্রাসিয়য় রাজ্য গঙ্গানদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাম্রলিপ্ত এই দেশেরই অংশ ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায়, সম্ভবত প্রাসিয়য়রা গঙ্গরিতইদের দেশের পশ্চিমে বাস করত। গ্রন্থাকার কার্টিয়াস এই দুই জাতিকে পৃথক জাতি বলেছেন। যদিও ডিওডোরাস গঙ্গরিতই ও প্রাসিয়য়দের এক ও অভিন্ন জাতি বলে বর্ণনা করেছেন।

প্লুটার্ক এক জায়গায় দুই জাতিকে গন্ডরিডই রাজার অধীনে আবার অন্য এক জায়গায় দুটি পৃথক রাজার উল্লেখ করেছেন। প্লুটার্ক লিখেছেন, গঙ্গরিতই ও প্রাসিয়য় রাজারা এক বিশাল বাহিনী সহ আলেকাণ্ডারের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। গবেষক অতুল চন্দ্র রায়ের মতে, গ্রীক লেখকদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে বলা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের সময় গঙ্গরিতই ও প্রাসিয়য় এই দুই জাতি একই রাজবংশের নেতৃত্বে অথবা দুই পৃথক রাজবংশের নেতৃত্বে যুগ্মভাবে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। আবার প্রাসিয়য়দের রাজধানীর নাম পালিবোথারা (পাটলিপুত্র) বলে গ্রীক লেখকরা দাবি করেছেন। তখন পাটলিপুত্র ছিল নন্দ রাজাদের শাসনাধীন। তবে কি নন্দ রাজারা বাঙ্গালী ছিলেন? এটাই আমার মনে সব সময় ঘুরছে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে বলেছেন, "এই সময় যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন প্রাচীন গ্রীক লেখকদের উক্তি হতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।"

"বৌদি আপনিও বীর বাঙ্গালীর বীরত্বময় ইতিহাস জানতে সমান আগ্রহী, তাই আপনাকে এই চিঠি লিখলাম। বিটিয়াকে ভালোবাসা দেবেন।"

এইভাবে রবীন্দ্ররবাবু তার চিঠি শেষ করেছেন। বলত, আমাদের ইতিহাস কত বীরত্বময়! আধা বিশ্বের বিজেতা বাঙ্গালী বীরের ভয়ে দিশেহারা। জাতির এই ইতিহাস সবাইকে জানাতে হবে, বীরকে বীর বলে ডাকতে হবে। বাঙ্গালীকে তার আত্মবিস্মৃত বীরত্বের গাথা শোনাতে হবে। তাই না! ভালো থাকিস।

ইতি— মা

যশোররাজ শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য

প্রিয় ধৃতি,

তোর শরীর খারাপ হয়েছিল তাও বলিসনি! কেন মা? জানি তুই যেখানে আছিস সেখানে অনেক ভাল ভাল ডাক্তার, হাসপাতাল রয়েছে। তোর সহকর্মীরাও খুব ভাল, তাও! আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা চিন্তা করব, টেনশন করব, তাতে আমাদের শরীর খারাপ হবে, তাই ভেবে জানাসনি, তাই তো! আমার ছোট্ট সোনা অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। তুই যতই বড় হোস, আমাদের কাছে ছোটই থাকবি, বুঝলি!

তবে হ্যাঁ, অসুস্থতার দিনগুলিতে ছত্রপতি শিবাজীর জীবনী পড়েছিস জেনে খুব ভালো লাগলো। আমাদের বাংলায় এই বীরের জীবন নিয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি, তাই বাঙালীরা এই বীরের হিন্দু রাজ্য গড়ার আকাঙ্খা, স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন,

সমাজকে একসূত্রে বাঁধার আকুলতা, রাজ্য পরিচালনার উৎকর্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা পড়ে অবশ্য বাঙালীর চোখ কিছুটা খুলেছে। জানিস মা, বেশ কয়েক বছর আগে তোর দাদু অর্থাৎ আমার শ্বশুরমশাই আমাকে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'হে রাজা শিবাজী' বই এনে দিয়েছিলেন। ওখান থেকেই তো তোকে গল্প শোনাতাম, মনে নেই! মধ্যযুগে এক বাঙালীও বিশাল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বাঙালী যুবকদের অস্ত্র ধরার সাহস যুগিয়েছিলেন। বাংলার কামারশালাগুলিতে পড়েছিল অস্ত্র তৈরির ধূম। হিন্দু গ্রামগুলিতে তখন শুধু তলোয়ারের ঝংকার। যদিও স্বপ্ন পূরণ হয়নি, কিন্তু স্বদেশ, স্বধর্ম রক্ষার গৌরবময় ইতিহাসে সে এক সুবর্ণ অধ্যায়। এই বীরের ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করে, ব্রাত্য করে রাখা হয়েছে বাংলার ছাত্র সমাজের কাছে। আজ সেই বীরের কথাই তোকে বলি। তাঁর নাম যশোহররাজ শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য। বাংলায় এক বড় অংশে তখন পাঠানদের রাজত্ব। দিকে দিকে চলছে তাদের অত্যাচার। নারী হরণ, মন্দির ধ্বংস, জোর করে ধর্মান্তর তখন নিত্য দিনের ঘটনা। ঘরে মেয়ে বড় হলে গৃহস্থের রাতের ঘুম চলে যেত। হিন্দু বীরেরা যে এর প্রতিকারে অস্ত্র ধরেননি তা নয়, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তখন অপ্রসন্ন। এদিকে মুসলমান রাজারা ভারতবর্ষে যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই হিন্দুদের নিরস্ত্র করার প্রয়াস চালিয়েছে। হিন্দুদের তখন অস্ত্র শিক্ষা তো বটেই আত্মরক্ষার জন্যও অস্ত্র রাখা এক সাংঘাতিক অপরাধ। সেনাবাহিনীতেও হিন্দুরা অচ্ছুত। হিন্দু কামারশালাগুলি হয় বন্ধ হয়ে গেছে, নয় হিন্দু হত্যার রসদ যোগানে বাধ্য হয়েছে। এই সময় তীক্ষ্ণ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য বাংলাকে পাঠানদের হাত থেকে মুক্ত করার ছক কষেন। নিজ কৃতিত্বে তিনি তখন গৌড়ের সুলতান দায়ুদ-এর কাছের মানুষ। তিনি ভেদ বিদ্যার প্রয়োগ করে প্রথমেই সুলতানকে তার বিশ্বাসভাজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। পরে সুকৌশলে সুলতানের কাছ থেকে কলিকাতা দক্ষিণপূর্বস্থ দুর্গম সুন্দরবন অঞ্চলের জমিদারী আদায় করে নিলেন। নদী ঘেরা এই অঞ্চলে তখন না ছিল কোনও জনপদ, না যাতায়াতের সুলভ ব্যবস্থা। এই দুর্গম জায়গায় শ্রীহরি গড়ে তুললেন যশোহর নগর। সারা গৌড় রাজ্যের বড় বড় হিন্দু পন্ডিত, ধনবান, প্রতিভাবান মানুষকে তিনি যশোর নগরে সসম্মানে বসবাসের অনুরোধ করলেন। দিকে দিকে হিন্দুরা যশোহর নগরে আসতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীহরি বড় বড় কামারশালা তৈরি করলেন এই শহরে। লোকচক্ষুর অন্তরালে গড়ে উঠতে থাকে এক হিন্দু সাম্রাজ্যের ভিত্। একে দুর্গম, তাতে সেখানকার বাসিন্দারা সবাই হিন্দু, সেই সঙ্গে স্বয়ং শ্রীহরির জমিদারী এটি, তার ফলে পাঠান নেতারা এবিষয়ে বিশেষ কিছু জানতেই পারে না। এদিকে শ্রীহরির প্ররোচনায় পাঠান সুলতান মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায়। শ্রীহরির পরামর্শে, সুলতান রাজ্যের রাজকোষ দুর্গম যশোহরে স্থানান্তরিত করে। যুদ্ধে পাঠানদের পরজয় ঘটে, প্রাণ যায় দায়ুদের।

কন্টকমুক্ত হল হিন্দু রাজ্য যশোহর। শ্রীহরি টাকা ছড়িয়ে লুব্ধ মুঘল সেনাপতিদের বশ করে আসন্ন ধ্বংস হতে নবীন হিন্দু রাজ্যটিকে রক্ষা করেন। সেখানে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্যর সৈন্য দলে কুড়ি হাজার পদাতিক ও সাত শতের বেশি যুদ্ধ নৌকা ছিল। তার জমিদারীর আয় ছিল প্রায় পনের লক্ষ টাকা। ক্রমে ক্রমে যশোর রাজ্য শক্তিশালী হতে থাকে কিন্তু শ্রীহরি বাংলার মুসলমান জমিদার হোক, আর মুঘল পাঠান হোক, সকলের সঙ্গে সখ্য রেখে যশোর রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁর মৃত্যুর পর যশোহর রাজ্যের রাজা হন তাঁর পুত্র প্রতাপাদিত্য।

আজ অনেক রাত হয়েছে। পরে একদিন প্রতাপাদিত্যের কাহিনী শোনাব। আজ তবে রাখি, কি বলিস!

ইতি— মা

বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্য

প্রিয় ধৃতি,

ভালো আছিস মা! এর আগে তোকে যশোররাজ শ্রীহরির কথা বলেছিলাম না! আজ তোকে বীর পুত্র প্রতাপাদিত্যের কথা বলব। পনেরশ ষাটের দশক, মুঘল শাসক আকবর তখন শাসন ক্ষমতা হাতে নিচ্ছেন। গৌড়ের পাঠন শাসকদের সূর্য তখন ডুবেছে। এক অখণ্ড হিন্দু রাজ্যের স্বপ্ন নিয়ে শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য যশোহর রাজ্যের স্থাপনা করেছেন। মুঘল-পাঠানদের চোখ বাঁচিয়ে তিনি যশোহর রাজ্যকে দুর্ভেদ্য করে তুলেছেন। সারা বাংলা থেকে হিন্দুদের এনে তিনি যশোহরে প্রতিষ্ঠিত করছেন। গড়ে তুলেছেন এক বিরাট সেনা দল। এই বীর পুরুষের পুত্র প্রতাপাদিত্য। যৌবনে প্রতাপ শিক্ষা লাভের অছিলায় মুঘলদের প্রাণকেন্দ্র আগ্রায় যায় এবং ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয় পিতার ইচ্ছায়। স্বদেশে ফিরে প্রতাপ নিজের সমবয়সী শঙ্কর, সূর্যকান্ত, মদন, সুন্দর ইত্যাদি বীরদের নিয়ে বিরাট সৈন্যদল গড়ার চেষ্টা শুরু করেন। প্রতাপ এক দল শ্রমজীবি সৈন্য নিযুক্ত করে, যারা অল্প সময়ে শুষ্ক জমিকে নদীরূপে পরিবর্তিত করে তুলত। অবিশ্বাস করছিস মা! ১৮০৩ সালে রামরাম বসু কর্তৃক সঙ্কলিত প্রতাপাদিত্যের জীবনীতে এই তথ্য রয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য থেকেও প্রতাপ সম্পর্কে জানা যায়। জানিস, আজকে সাগরদ্বীপ যেটা, সেটা ছিল প্রতাপের নৌ আড্ডা। প্রতাপ রাজ্য জুড়ে হিন্দু যুবকদের ধনুর্বান, খড়্গ এবং বন্দুক ব্যবহারের কলাকৌশল শেখানোর জন্য একদল প্রশিক্ষক নিয়োগ করলেন। দিকে দিকে ব্যায়ামাগার, অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠল। বৈদেশিক পর্তুগীজ, ইংরাজ বণিকদের কাছ থেকে বন্দুক,

কামান সংগ্রহ শুরু করেন প্রতাপ।

জগদ্দল দূর্গ, সালিকা দূর্গ, রায়গড় দূর্গ, মাতলা দূর্গ প্রভৃতি গড়ে উঠল। যশোহরের কাছেই ধূমঘাট নামে বিশাল দূর্গ ও নগর প্রতিষ্ঠা করলেন প্রতাপ। এটাই হল প্রতাপের নতুন রাজধানী। এই দূর্গ দূর্ভেদ্য, সুরক্ষিত ও কামান শোভিত ছিল। এবার বাংলার অন্যান্য ভূস্বামী, গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ, মুসলমান সর্দার, পর্তুগীজদের উপস্থিতিতে প্রতাপের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হল। প্রতাপের এই ঐশ্বর্য হিজলির মুসলমান জমিদারের সহ্য হল না। ফলে শুরু হল যুদ্ধ। প্রতাপ যশোরেশ্বরীর পূজা করে যুদ্ধ শুরু করলেন। প্রতাপের অশ্বারোহী, পদাতিক, নৌসৈন্য একযোগে হিজলি আক্রমণ করল। ঘোরতর যুদ্ধে হিজলিপতি প্রাণ হারাল। প্রতাপের প্রতিষ্ঠা আরও বেড়ে গেল। বাংলাদেশের হিন্দুরা তার মধ্যে আশার আলো খুঁজে পেল। সারা বাংলার হিন্দুরা মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার অবলম্বন পেল। যশোর রাজ্যে তখন নতুন নতুন গ্রাম গড়ে উঠছে। হিন্দু প্রজা মুসলমান রাজ্য ছেড়ে সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। সমর্থবান হিন্দু যুবারা প্রতাপের সেনায় নাম লেখাচ্ছে। প্রতাপ জানত, একদিন না একদিন মুসলমান জমিদাররা একজোট হয়ে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেই, হয়ত সে যুদ্ধে মুঘলদেরও ডেকে আনবে। তাই তিনিও তলে তলে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। নতুন নতুন দূর্গ তৈরির কাজ শুরু হল, দূর্গে খাদ্য অস্ত্র সংগ্রহ করে রাখা হল। প্রতাপের গুপ্তচর মুঘল কর্মচারীদের মধ্যে থেকে তাদের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শুরু করল। প্রতাপের বাল্যবন্ধু শঙ্কর রাজ্যময় ঘুরে ঘুরে সৈন্য সংগ্রহ শুরু করলেন। মুসলমান ফকিরদের উপর কড়া নজর রাখা শুরু হল। কারণ, তারাই গৌড়রাজ গনেশ-এর হিন্দু রাজ্য ধ্বংসের জন্য সারা ভারতের মুসলমান রাজাদের কাছে দরবার করেছিল। প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করলেও প্রতাপ কিন্তু আগবাড়িয়ে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধালো না। বরং আরও শক্তি ও রসদ সংগ্রহের উপর জোর দিল। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ সুবেদার হয়ে বাংলায় এলে প্রতাপ তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। মানসিংহও মনেপ্রাণে একটি হিন্দুরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা দেখে খুশিই হলেন। মুঘল আকবরের তখন বাংলার ছোট ছোট জমিদারদের শায়েস্তা করতেই ব্যস্ততা, ফলে তিনিও আগবাড়িয়ে প্রতাপের সঙ্গে বিবাদে গেলেন না। এককথায় দুই দলই নিজ স্থিতি মজবুত করার চেষ্টায় মগ্ন থাকল। যদিও দুজনই জানত, যুদ্ধ অনিবার্য। আকবরের মৃত্যুর পর মুঘল শাসক হল জাহাঙ্গীর। তিনি প্রতাপের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভয় পেলেন। যেনতেন প্রকারে তাকে দমন করতে চাইলেন তিনি। বাংলা জয়ের জন্য জাহাঙ্গীর সুবেদার ইসলাম খাঁকে পাঠালেন। প্রতাপ গুপ্তচর মারফত আগেই সব জানতে পেরেছিলেন। তিনি নিজ পার্ষদদের সঙ্গে বসলেন। সকলের এক কথা— আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু প্রতাপ আরও কিছুটা সময় নিতে চাইলেন। এর কারণ অবশ্য অজ্ঞাত, জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, আগ্রায় থাকাকালীন প্রতাপ সারা ভারতব্যাপী হিন্দু রাজাদের সঙ্গে জোট গড়ার প্রক্রিয়া শুরু

করেছিলেন। হয়ত এজন্যই এই সময় নেওয়া। জানিস মা, সেদিন যদি এই শুভ জোট গড়ে উঠত, তবে হয়ত দেশ আজ অখণ্ড থাকত। যশোহর আজ ভারতবর্ষের অভিন্ন অঙ্গ হত। যাই হোক, এই সময় কেনার জন্যই প্রতাপ তড়িঘড়ি এক মুসলমানকে মন্ত্রী করে বহু উপঢৌকন সহ রাজমহলে অবস্থানরত মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁর কাছে পাঠালেন। ইসলাম খাঁ প্রতাপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বাংলাদেশের নাটোরের কাছে বজ্রপুর নামক স্থানে দুজনের দেখা হয়। প্রতাপের শক্তিতে ভীত ইসলাম খাঁ প্রতাপের শক্তিকে বাংলার অন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে চালিত করতে চাইলেন। তিনি মুঘল রাজ্য জয়ে প্রতাপের সাহায্যের আবেদন করলেন। ধূর্ত ইসলাম খাঁ প্রতাপকে যুদ্ধের জালে ফাঁসিয়ে তার শক্তি ক্ষয় করতে চাইলেন। প্রতাপ ব্যাপারটা বুঝলেন এবং তিনিও উল্টো চাল দিলেন। তিনি মুঘলদের সাহায্য করবেন বলে কথা দিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নিলেন না। কিন্তু ইসলাম খাঁ একের পর এক বাংলার জমিদারদের পরাজিত করতে থাকলেন। ওদিকে অনেক মুসলমান জমিদার মুঘল সেনাপতির পক্ষে যোগ দিলেন। তারা ইসলাম খাঁকে প্রতাপের রাজ্য আক্রমণে প্ররোচিত করতে থাকেন। অবশেষে ১৬১১ খৃস্টাব্দে ইসলাম খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্য যশোর রাজ্যের দিকে আক্রমণ হানল। লড়াইয়ে কখনও মুঘল পতাকা ওড়ে তো কখনও প্রতাপের। দুর্ভাগ্য বাংলার, দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, দুর্ভাগ্য হিন্দুর, সেদিন আর্যাবর্তের কোনও হিন্দু রাজা প্রতাপের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। অত্যাচারী মুঘলরা একের পর এক গ্রাম, নগর জ্বালিয়ে দিতে থাকে। প্রতাপকে নাগালে না পেয়ে মুঘলদের অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে যশোর রাজ্যের হিন্দু জনতা। যদিও তখন প্রতাপ লড়াই চালিয়ে যেতে সমর্থ ছিলেন, তা সত্ত্বেও মুঘল অত্যাচার থেকে প্রজাকে রক্ষা করতে তিনি মুঘলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তার পরের ইতিহাস আর জানা যায়নি। প্রতাপের পুত্রদের বন্দী করে দিল্লী পাঠানো হয়। কিন্তু তারপর কি হয় সবটাই অজ্ঞাত। মুঘল সৈন্য পরবর্তী ছয় মাস যশোহরে ছাউনি ফেলে থাকে। ছারখার করে দেয় হিন্দু রাজ্য যশোর। শেষ হয় এক সুবর্ণময় ইতিহাস। এই প্রতাপের বংশধররা কি কখনও হীনবল, দুর্বল হতে পারে! বল মা! বাঙালীদের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজন যে গৌরবময় ইতিহাসের সেই স্বর্ণিম অধ্যায়ই বাংলার ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে বরাদ্দ হয়নি। ভাবতে বড় কষ্ট হয় মা। আজ তবে শেষ করছি, ভাল থাকিস।

ইতি— মা

উত্তর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রনায়ক— ধর্মপাল

প্রিয় ধৃতি,

কেমন আছিস মা। আমরা সবাই পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। মাঝে তোর দাদুর শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভালো আছেন। তোর সাথে যে মেয়েটি থাকে তার বাড়ি নাকি কনৌজে। সে দিন তোর বাবা বলছিল। জানিস মা, এই কনৌজ দখলকে কেন্দ্র করে একদিন অন্তহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শক্তি। প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও বাংলার পাল। এই তিন সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিল বাঙালী সেনা। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এর কথায়, "খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালই উত্তর ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক।" ঐতিহাসিক পিপার বলেন, "জার্মান সম্রাট কাইজার প্রথম ও দ্বিতীয় উইলিয়ামের রাজত্বকালে জার্মান জাতি যেভাবে সমগ্র মধ্য ইউরোপে প্রভুত্ব করেছে ঠিক একইভাবে ধর্মপাল ও তার পুত্র দেবপালের সময় বাঙালি জাতি সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বাঙালির ইতিহাসে ধর্মপালের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজ বাহুবলে বাংলায় শুধু যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন তা নয় আর্যাবর্তের বৃহদাংশে প্রভুত্ব বিস্তার করে বাংলার মর্যাদা অভাবনীয় বৃদ্ধি করেছিলেন।"

ধর্মপালের রাজ্যকে বলা হয় 'বাঙালির জীবনপ্রভাত'। পিতা গোপালের মৃত্যুর পর ৭৭০ খৃষ্টাব্দে ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একধারে চতুর রাজনীতিজ্ঞ, অন্য দিকে সুনিপুণ যোদ্ধা। সমগ্র আর্যাবর্তে এক সার্বভৌম রাজশক্তি স্থাপন করাই ছিল তার জীবনের স্বপ্ন।

পিতা মহারাজ গোপালদেবের সময় বাঙালি সেনা সম্পূর্ণ মগধকে জয় করেছিল। কিন্তু মগধের বাইরে বাঙালি সেনার বিজয় নিশান উড্ডীন হয়নি। এদিকে উত্তর ভারতের কর্তৃত্ব নিয়ে তখন প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। ধর্মপালও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়ে উত্তর ভারতে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করতে চাইছিলেন। ধর্মপাল সাম্রাজ্যবিস্তারের জন্য পশ্চিমমুখে অগ্রসরের সিদ্ধান্ত নিলেন। দলে দলে বাঙালি যুবক সেনাদলে যোগ দিতে লাগল। বাংলা জুড়ে তখন শুধু রণ অভিযানের হুংকার আর তলোয়ারের ঝংকার। বিশাল গৌড়ীয় সেনা গৌড়েশ্বরের জয়ধ্বনি করতে করতে উত্তরাপথে বিজয়-যাত্রা করল। বঙ্গরাজ শশাঙ্কের পর আর এক বাঙালি সম্পূর্ণ আর্যাবর্ত জয় করতে চলল। ধর্মপাল প্রথমেই বাধা পেলেন প্রতিহার রাজ বৎসরাজ এর কাছে। এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।

রাষ্ট্রকূট-রাজ প্রতিহার সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে এগিয়ে আসছে খবর পেয়ে প্রাথমিকভাবে ধর্মপাল পিছু হটেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকূট-রাজ ধ্রুব প্রতিহার-রাজকে আক্রমণ করে এবং ধর্মপালের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন প্রতিহার সেনাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। প্রতিহার-রাজ প্রাণ বাঁচাতে রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নেন। এবার ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হন। কিন্তু ধ্রুব শুধু প্রতিহাররাজকে পরাজিত করেই চুপ থাকলেন না। তিনি ধর্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মপাল জানতেন দক্ষিণ ভারতের রাজা ধ্রুবর পক্ষে এত দূরে উত্তর ভারতে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। তাই তিনি পিছু হটেন। ধ্রুবও বাংলার দিকে অগ্রসর না হয়ে সম্পূর্ণ ভারত জয় করার কৃতিত্ব নিয়ে দক্ষিণাপথে ফিরে যান। ইতিমধ্যে বঙ্গরাজ ধর্মপাল বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে নিয়েছেন। এবার তিনি নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। উত্তর ভারতের তৎকালীন কেন্দ্র কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করে নিজ মনোনীত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান। মালদহের নিকট খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্মপালের তাম্রশাসন অনুসারে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার, কীর দেশের রাজারা ধর্মপাল কর্তৃক এই রাজা পরিবর্তন মেনে নিয়ে চক্রায়ুধের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে মনে করা হয় সকল রাজারা ধর্মপালের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিলেন। কনৌজ জয়ের পর ধর্মপাল সিন্ধুনদ পর্যন্ত অগ্রসর হন ও পাঞ্জাব জয় করেন। বিন্ধ্য পর্বত অতিক্রম করে তিনি দক্ষিণ ভারতেও কিছুদূর অগ্রসর হন। এদিকে নবম শতকের প্রথম দিকে প্রতিহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গ রাজদের সঙ্গে নিয়ে একযোগে কনৌজ আক্রমণ করেন। চক্রায়ুধ পিছু হটে। এদিকে ধর্মপালও সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ধর্মপালের সাহায্যে এগিয়ে আসে রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ। নাগভট্ট তখন নিজ রাজ্য বাঁচাতে ফিরে যায়। অন্য দিকে গোবিন্দ দক্ষিণাপথে ফিরে যায়। ফলে উত্তর ভারতে ধর্মপালের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। রাষ্ট্রকূট রাজের প্রশস্তি অনুসারে ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দে আনুগত্য স্বীকার করেছিল। কিন্তু পরিস্থিতি বিচার করলে মনে হয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ধর্মপাল লোকক্ষয় এড়ানোর জন্যই হয়তো গোবিন্দকে তুষ্ট রেখেছিলেন কারণ গোবিন্দকে কখনও ধর্মপাল কর পাঠাননি, ফলে আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন এমনটা বলা যায় না। এবার ধর্মপাল সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে নিজ প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করেন ও মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু জানিস মা, ধর্মপালের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ও সোমপুরী বিশ্ববিদ্যালয়, যা এই বাঙালি নরপতিকে বিশ্ব ইতিহাসে অমরত্ব প্রদান করেছে। ভালোবাসা নিস মা।

ইতি — মা

বিক্রমপুররাজ চাঁদ রায় ও কেদার রায়

প্রিয় ধৃতি,

কি রে মা, কেমন আছিস! না কোনও ফোন না কোনও চিঠি, ব্যাপারটা কি! শরীর টরীর খারাপ হয়নি তো? দেখিস মা তোর আবার ঠাণ্ডার ধাত রয়েছে। একটু সাবধানে থাকিস। ও হ্যাঁ, তোর পাঠানো বিজয়নগর সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় বইটা আজ পড়ে শেষ করলাম। লেখক দারুন ভাবে তৎকালীন ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। ভাবতে অবাক লাগে, যাকে বৈদেশিক পর্যটকেরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বর্ণনা করেছেন, যার রাজত্বে প্রজারা সুখে শান্তিতে দিনযাপন করেছে, তাঁর ইতিহাসই বর্তমান স্বাধীন ভারতবর্ষে ব্রাত্য। শোন মা, তোকে আজ বাংলার এক স্বর্ণময় ইতিহাসের কথা বলি। ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা। এই সময় বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা দেশজুড়ে প্রতাপ, কেদার, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দ রায়, হামীর প্রমুখ বীরদের প্রভাবে মুঘল শাসকদের বাংলা জয়ের স্বপ্ন ভেস্তে গিয়েছিল। মুঘল সেনারা তখন বাংলার জল-মাটিতে পা দিতে ভয় পেত। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের, বাঙালী বীররা প্রত্যেকেই লড়েছেন একা একা। আর মুঘল শাসকদের তুরুপের তাস তখন বিশ্বাসঘাতক হিন্দু বীর ভগবান দাস মান সিংরা। হিন্দু লড়েছে হিন্দুর বিরুদ্ধে, ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বিধাতার কি আশ্চর্য খেলা, যে রাজপুত জাতি ২০০ বছর ইসলামী সেনাকে ভারতের মাটিতে পা রাখতে দেয়নি, যারা বারে বারে ধর্মরক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছে, তাদেরই লড়তে হচ্ছে হিন্দুর বিরুদ্ধে। যাক আজ তোকে বলি চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কথা। চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়। এরা ছিলেন পূর্ব বাংলার বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা। কালীগঙ্গা ও মেঘনা সঙ্গমের তীরে শ্রীপুর নগর ছিল রায়দের রাজধানী। রায় রাজাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপুরের প্রসিদ্ধিও বাড়তে থাকে। শ্রীপুর তখন পূর্ববঙ্গের একটি নামকরা বন্দর। বর্তমানে শ্রীপুর কীর্তিনাশা নদীগর্ভে বিলীন। রায় রাজাদের কীর্তিনাশ করেছে বলেই হয়তো নদীর এই নাম। বিক্রমপুর প্রদেশের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই অঞ্চল নদনদী দ্বারা বিভক্ত ও চর-দ্বীপে পূর্ণ। ফলে বৈদেশিক শত্রুর পক্ষে এই অঞ্চল জয় করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। তাতে আবার কেদার রায়ের ছিল বিখ্যাত নৌবাহিনী। বার বার মুঘলসেনা কেদারের উপর আক্রমণ হানলেও তার সাথে কোনও ভাবেই এঁটে উঠতে পারছিল না। ফলে মুঘলরা রণে ভঙ্গ দেয়। একদিন কেদার রায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলের মুঘল অধিকৃত সন্দীপ নামক অঞ্চলের উপর হামলা চালিয়ে সেটি দখল করে নেন। সন্দ্বীপ দখল শ্রীপুরের সুরক্ষার জন্য জরুরি ছিল। সন্দ্বীপ হাতছাড়া হওয়ার খবর পেয়ে মুঘলরা ক্ষেপে ওঠে। মান সিংয়ের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী বাংলার দিকে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে কেদারও যুদ্ধের

প্রস্তুতি শুরু করেন। মুঘল ও কেদারের দ্বন্দ্বের সুযোগে আরাকানের মগ রাজা সন্দ্বীপ-এর উপর হামলা করতে এগিয়ে আসে। তার সঙ্গে প্রায় দেড়শ রণতরী। কেদারও একশ যুদ্ধজাহাজ পাঠান সন্দ্বীপ রক্ষায়। ১৬০২ খৃষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর বাঙালী ও মগ বাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। কেদারের পর্তুগীজ সেনাদলও কার্ভালোর নেতৃত্বে এই যুদ্ধে যোগ দেয়। শেষপর্যন্ত বাঙালী সেনা যুদ্ধে বিজয় পায়। হাতে গোণা কয়েকজন মগ সেনা প্রাণে বেঁচে দেশে ফেরে। আরাকান রাজের বহু তীর, বন্দুক, কামান বিজয়ী বাঙালী সেনার দখলে আসে। পরাজয়বার্তা শুনে আরাকান রাজ এক হাজার রণতরী সহ শ্রীপুর রাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সন্দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসে। এবারও বাঙালী সেনা বিজয়ী হয়। দেশ জুড়ে কেদারের বীরত্বের কথা ছড়িয়ে যায়। মুঘলরা পড়ল বিপদে। একে পরাজয়ের অপমান, তার উপর ক্রমে কেদারের শক্তি বৃদ্ধি তাদের কপালে ভাঁজ ফেলে। মুঘল সেনাপতি মান সিং মন্দারায় নামক এক বাঙালীকে সেনাপতি করে শ্রীপুর অভিযানে পাঠান। মেঘনার উপকূলে দুই বাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ হল। কেদার রায়ের সেনাদলের পরাক্রমে মুঘল সেনাপতি মন্দারায় পরাজিত ও নিহত হন। পরাজয় বার্তা পাওয়া মাত্র মান সিং ক্রুদ্ধ হন। অপমানের জ্বালায় এক বিশাল বাহিনী সহ শ্রীপুরের দিকে ধেয়ে আসেন। কেদার কিছুটা সময় নেবার লক্ষ্যে মান সিংয়ের সঙ্গে সন্ধি করেন। মান সিংও তাই চাইছিলেন যাতে কোনও ক্রমে মান বাঁচে। কিন্তু বছরঅন্তে কেদার মুঘল দরবারে কোনওরূপ কর পাঠাতে অস্বীকৃত হন। এবার মান সিং তার সেনাপ্রমুখ কিলমককে শ্রীপুর প্রেরণ করেন। শ্রীনগর নামক কেদারের রাজ্যভুক্ত সমৃদ্ধনগরে মুঘল সেনা হামলা করলে, বাঙালী সেনার সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধেও মুঘল সেনাপতি বাঙালী বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হয়। এবার এক বিশাল সেনা সহ মান সিং নিজেই যুদ্ধে এগিয়ে আসেন। জলে, স্থলে সাতদিন লাগাতার যুদ্ধ চলে। বাঙালী সেনার দাপটে মুঘলসেনার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এমন সময় গোলার আঘাতে কেদার প্রাণ হারান। ফলে নেতৃত্বহীন বাঙালী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়। বিক্রমপুরের সূর্য চিরতরে অস্ত যায়।

তথাকথিত অজেয় মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়েছে বিক্রমপুরের মতো এক ছোট প্রদেশের রাজার হাতে। তাও একবার নয়, বারবার। এই ছোট প্রদেশ জয় করতে ছুটে আসতে হয়েছে মুঘল সেনাপতিকে। কিন্তু মা, একি কম গৌরবকাহিনী? এই সকল বীর বাঙালীকে বর্তমান বাঙালী যুব সমাজের সামনে তুলে ধরতে হবে। চিৎকার করে বলতে হবে, আমরা হীনবল নই, আমরাও নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইসলামী শাসকদের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়িয়েছি। ছিনিয়ে নিয়েছি বিজয়পতাকা।

ভালো থাকিস মা।

ইতি— মা

বীর সেনানায়ক দিব্য ও ভীম

প্রিয় ধৃতি,

কেমন আছিস। আমরা সবাই এখানে ভালো আছি। এই চিঠি দেখে তোর মনে প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছে তা আমি জানি। তুই ভাবছিস কলম ছেড়ে মা হঠাৎ পেনসিল দিয়ে লেখা শুরু করল কেন, তাই তো? কারণ, আমি ট্রেনে বসে এই চিঠি লিখছি। ঝাঁকুনির দরুন ট্রেনে পেন দিয়ে লেখা যায় না, কিন্তু পেনসিল দিয়ে দিব্যি লেখা যায়। আমি এখন জলপাইগুড়ির পথে। দারুন আনন্দ হচ্ছে। তুই সঙ্গে থাকলে আরো বেশি আনন্দ হোত। মামাবাড়ি বহুদিন পরে যাচ্ছি। সেই ছোটবেলায় প্রতি বছর মামার বাড়ি যেতামই যেতাম। তখন প্রায় একমাস আগে থেকে সে কত প্ল্যান। একে একে দাদু-দিদা চলে গেলেন। বড় মামার মৃত্যুর পর সেই শেষ গিয়েছিলাম। তখন তোর বয়স দশ বছর। তোর মনে আছে তো! একটু আগেই আমাদের ট্রেন মালদা স্টেশন ছাড়ল। রেল লাইনের দুই পাশের আমবাগান এখনও রয়েছে। এই মালদা জেলা আমের জন্য বিখ্যাত। একসময় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরের একটি গৌড় এখানেই অবস্থিত। এখনও এখানকার আম বিদেশে পাঠানো হয়। এখানকার প্রধান নদী মহানন্দার তীরে বারেবারে সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। আজ তোকে এমনই এক বীর বাঙ্গালীর কথা বলি। গৌড় সাম্রাজ্যের সম্রাট তখন দ্বিতীয় মহীপাল। অন্তঃবিদ্রোহের ফলে পাল সাম্রাজ্য খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে। কর্ণাটকের চালুক্য রাজারা বারে বারে বাংলায় আক্রমণ হানছে। চালুক্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উড়িশ্যার রাজারাও আক্রমণ হানছে। এমন দুর্দিনে পিতা তৃতীয় বিগ্রহ পালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেছেন দ্বিতীয় মহীপাল। সিংহাসনে বসেই দ্বিতীয় মহীপাল রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূর করতে সচেষ্ট হলেন। কিন্তু করলেন উল্টোটাই। কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি তার দুই ভাই দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপালকে কারারুদ্ধ করলেন। সাম্রাজ্যের চারিদিকে বিদ্রোহ শুরু হল। সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে বরেন্দ্রভূমির সামন্তরা। বরেন্দ্রভূমি বলা হয় বর্তমান মালদা জেলায় প্রবাহিত মহানন্দার সমভূমির পূর্বভাগের রুক্ষ ভূমিখণ্ডকে। এই বরেন্দ্রভূমির বেশির ভাগটাই এখন বাংলাদেশের মধ্যে পড়ে। যাই হোক, দ্বিতীয় মহীপাল মনে করেন এ বিদ্রোহ দমন করতে আর কতক্ষণ। তিনি অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হলেন। অবশ্য অনেকে বলে, তাকে ছল করে হত্যা করা হয়। দ্বিতীয় মহীপাল ছিলেন অযোগ্য ও অত্যাচারি শাসক। ফলে জনগণও দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে ছিল। দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর বরেন্দ্রভূমিতে চরম অব্যবস্থা দেখা দেয়। বাড়তে থাকে শত্রু আক্রমণের ভয়। বাঙ্গালীর এই দুর্দিনে নিজ বীরত্বে ও সাহসকে সম্বল করে দিব্য নামে এক সামন্ত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সুপ্রতিষ্ঠিত পাল রাজত্ব উল্টে দিয়ে বরেন্দ্রীতে

স্বাধীন সাম্রাজ্য স্থাপন সেকালের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। দিব্য ছিলেন কৈবর্ত জাতিভুক্ত, ফলে অনেক ঐতিহাসিক এই বিদ্রোহকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বলে ছোট করে দেখাতে চান। কিন্তু বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা করলে বোঝা যাবে, এ বিদ্রোহ ছিল অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দেশভক্ত বীরদের অসম লড়াই। কুশাসক মহীপালকে হত্যা করে বাংলাকে আসন্ন বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন দিব্য। সেই সঙ্গে মানুষকে রক্ষা করেছিলেন কুশাসক দ্বিতীয় মহীপালের হাত থেকে। তার এই মহৎ কাজের জন্যই বরেন্দ্রের জনগণ তাঁকে রাজপদে নির্বাচিত করেছিলেন বলে মনে হয়। দিব্য অবশ্য নিশ্চিন্তে রাজ্যভোগ করতে পারেননি। তাকে বারবার আক্রমণের শিকার হতে হয়। পাল বংশের রাজা রামপালও নিজ রাজ্য উদ্ধারে সচেষ্ট ছিলেন। তা সত্ত্বেও বরেন্দ্র থেকে মিথিলা পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ দিব্যর অধিকারে ছিল। তিনি তাঁর রাজধানী বরেন্দ্রীতে প্রকাণ্ড এক দীঘি খনন করেন ও তার কেন্দ্রে এক সুউচ্চ প্রস্তরস্তম্ভে স্থাপন করেছিলেন। দীঘি ও স্তম্ভ আজও লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করে। দীঘির উত্তরদিকে রাজধানীর ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। দিব্যর মৃত্যুর পর রুদোক ও তারপর ভীম শাসনভার গ্রহণ করেন। পাল বংশের রাজা রামপালের সভাকবি সন্ধাকর নন্দী তার রচিত রামচরিতেও শত্রুপক্ষের গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলেছেন, 'ভীম ও তাহার পিতা ও পিতৃব্য কেবল চরিত্রবান লক্ষ্মীবন্ত ছিলেন না, তাঁহারা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের বরপুত্র ছিলেন। বরেন্দ্ররাজ ভীমের প্রশংসায় সন্ধাকর নন্দী লিখলেন— 'বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতী ও লক্ষ্মী যাঁহার অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুদলের শ্রেষ্ঠ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্যন্ত তাহার অধীন হইয়াছিল। যে রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করেন...।'

পাল রাজা রামপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারে ব্রতী হন। কিন্তু ভীমের ন্যায় এরূপ প্রজাপ্রিয়, বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী নরপতিকে পরাজিত করা সহজসাধ্য ছিল না। রামপাল সামন্তরাজাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ ও সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে হাত করেন। রামপালের মামা রাষ্টকূট রাজ এক বিশাল সৈন্য ভীমের বিরুদ্ধে পাঠান। রামপালের বাহিনীতে যোগ দেয় মগধের রাজা ও রামপালের ভাই দ্বিতীয় শূরপাল। সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণে ভীম পরাজিত হন।

আজ তবে রাখি। ভালো থাকিস।

ইতি— মা

বিষ্ণুপুরের রাণী চন্দ্রপ্রভা

প্রিয় ধৃতি,

আশা করি রাধামাধবের অশেষ কৃপায় ভালো আছিস। আমরা সবাই এখানে ভালো আছি। অনেকদিন পর গতকাল তোর দুটো চিঠি একসঙ্গে পেলাম। চিঠিগুলি খুলে দেখি একটা তুই গত সপ্তাহে পাঠিয়েছিস, অন্যটি গত মাসের প্রথম সপ্তাহে লেখা। কি রকম ভুতুড়ে ব্যাপার বল! আর আমরা কিনা সব দোষ তোর ঘাড়ে চাপাচ্ছি। বলি মেয়েটা একটা চিঠিও লেখে না। আর এদিকে দেখ না, বলা নেই, কওয়া নেই কাল রাতে হঠাৎ তোর ঝুনুদি হাজির। আমরা কেবল খেয়ে উঠেছি। এমন সময় বেল বাজল। দরজা খুলে দেখি, নতুন জামাই সহ মেয়ে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, কোনওক্রমে ভালোমন্দে খাবার পাট চুকতে চুকতে বাজল রাত্রি বারোটা। এরই ফাঁকে আমি তোর দিদিকে চেপে ধরতেই মেয়ের সেকি কথা, বলে মামার বাড়ি আবার বলে কেউ আসে নাকি! যা হবে তাই দিয়েই খাব। মূল ব্যাপারটা হল একসঙ্গে সবাই আনন্দ করা। অবশ্য তোর জামাইবাবুটা খুব ভালো। ওরা রাজস্থানে বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে আমাদের বাড়ি এসেছে। একটু বলে কয়ে এলে জামাইটার আর একটু বেশি আদর-যত্ন করা যেত। সে কত গল্প, কত গল্প। সারা রাজস্থানের ইতিহাস কাল আমাদের সামনে তুলে ধরল দুজন মিলে। কত বলিদান, কত সংঘর্ষের, বীরত্বের গাথা সেগুলি। ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণময় অধ্যায়। প্রত্যেক ভারতবাসীর সে ইতিহাস একবার পড়া উচিত। গল্পগুলি শুনতে শুনতে চোখের সামনে যেন দৃশ্যগুলি ভেসে উঠছিল। রানা কুম্ভের বিজয়ী সেনা, প্রতাপের হলদিঘাটির প্রান্তরে ভীষণ যুদ্ধ, রাজপুত মা-বোনেদের স্বধর্ম রক্ষার জন্য হাসিমুখে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে 'জওহর ব্রত' পালন। জানিস মা, আমাদের বাংলার মেয়েরাও স্বধর্ম রক্ষায় কতবার প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু সেকথা কোনও ইতিহাসে স্থান পায়নি। রাজস্থানের ঐতিহাসিকরা যেভাবে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসকে মনে রেখেছে, আমরা বাঙালীরা সে ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছি। আমরা কি মনে রেখেছি স্বধর্ম রক্ষার জন্য বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ বংশের রাণী চন্দ্রপ্রভার কথা? গড়পড়তা বাঙালী যখন রাজস্থানের বীরঙ্গনাদের স্বধর্ম রক্ষার জন্য 'জওহর ব্রত'র কথা বলে, তখন সেইসব পুণ্যবতীদের জন্য তাদের মনে অশেষ শ্রদ্ধা, সমীহ দেখা দেয়। কিন্তু স্বধর্ম, স্বভূমি রক্ষার জন্য নিজ স্বামীকে হত্যা করতেও যিনি পিছুপা হননি, সেই পুণ্যবতী বাঙালী রমণীর কথা কয়জন মনে রেখেছে! আমরা মা-বাবারা সন্তানকে তার বীর পূর্বপুরুষের সঙ্গে পরিচয় না করালে কে করাবে? বাঙালী হিন্দুরা কি চিরদিন পরাজিত, অপমানিত হয়ে জন্মস্থান ছেড়ে পালিয়ে আসার লজ্জার কথাই তার উত্তরপুরুষদের শোনাবে! আর কত দিন! শত্রুদের মুখের কথা ভেতো বাঙালী, দুর্বল কাপুরুষ বাঙালী

কতদিন আমরা আওড়াবো! আমরা বীর, আমাদের ইতিহাস বীরত্বের ইতিহাস— একথা চিৎকার করে বলতে হবে। কবিগুরু লিখেছেন—

"বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু যদি কি শিখানু তা'রে?"

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে বিষ্ণুপুরে মল্লরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরুষানুক্রমে মল্লরাজদের বীরত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই বংশের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রাজা বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা নেন শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে। তখন থেকেই মদনমোহন বিষ্ণুপুরের উপাস্য দেবতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় চলছে তখন। দিল্লীতে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব সারা হিন্দুস্থান থেকে হিন্দু শেষ করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। দিকে দিকে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। হিন্দু শক্তি সারা ভারত জুড়ে যেন গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। ইসলামী শাসকদের দিন যে শেষ, সে দেওয়াল লিখন তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরেও বীর হাম্বীর পুত্র রঘুনাথ সিং সিংহাসনে বসেছেন। তিনি যেমন বীর, তেমনি ধার্মিক। তাঁর আমলে শ্যাম রায়, জোড়া বাংলা মন্দির নির্মিত হয়। সেই সময় চন্দ্রকোণার ক্ষুদ্র ভূস্বামী শোভা সিংহ মুঘলদের আধিপত্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক অঞ্চল জয় করতে থাকেন। বাংলার সুবেদার পর্যন্ত তাঁর সামনে দাঁড়াতে দু-বার ভাবত। হুগলীর ফৌজদার ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। এমনই এক সময় কূটনীতির চালে মুঘল শাসক রঘুনাথ সিংকে শোভা সিংহের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। এটা মুঘলদের চিরাচরিত কূটনীতি। কারণ এই যুদ্ধে যে দলেরই হার হোক, আখেরে ক্ষতি হবে হিন্দু শক্তির। এবারও তারা সাফল্য পায়। মল্লরাজের কাছে শোভা সিংহ পরাজিত হন। ধ্বংস হয় তাঁর সৈন্য-সামন্ত। হুগলীর দুর্গ জয় করেন রঘুনাধ সিং। বিষ্ণুপুরে বেজে ওঠে বিজয় শঙ্খ। রাণী চন্দ্রপ্রভা বিজয়ী রাজার অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত। অপেক্ষমান চন্দ্রপ্রভা দুর্গদ্বারে তোপধ্বনি আর দামামার শব্দে মনে করলেন এই বুঝি রাজা এলেন, কিন্তু রাজা আর রাজমহলে এলেন না। তিনি লালবাঈ নামে এক প্রমোদ সহচরীকে নিয়ে আমোদে মাতলেন। রাণী একেই নিজ ভবিতব্য মনে করে পূজাপাঠে মন দিলেন। একদিন তিনি শুনলেন রাজা লালবাঈয়ের কথায় রাজ মহলের মন্দিরে পূজাপাঠ নিষিদ্ধ করেছেন। এর চেয়েও ভয়ঙ্কর খবর এল একদিন— রাজা নাকি নিজধর্ম বিসর্জন দিয়ে ইসলাম কবুল করবেন। রাণী চুপ থাকতে পারলেন না। সংকল্প স্থির করে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠিয়ে নিভৃতে পরামর্শ করলেন। শেষে বিষ্ণুপুরের ধর্ম ও সম্মান রক্ষার জন্য মন্ত্রীকে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। রাজা নিহত হলেন। চিতামঞ্চে শায়িত রাজাকে দেখে অনেকেই ভাবলেন, কি কঠোর রাণীর হৃদয়। কিন্তু বিষ্ণুপুরের ধর্মরক্ষার আর কি কোনও উপায় ছিল? চিতায় অগ্নি সংযোগের সময় দেখা গেল, নববধূ বেশে রাণী চন্দ্রপ্রভা সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। তিনি চিৎকার করে বলেন, 'স্বামীঘাতিনী হলেও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার অধিকার আমার আছে'। সব বাধা উপেক্ষা করে তিনি জ্বলন্ত চিতায় সঁপে দিলেন নিজ প্রাণ। কঠোর ভাবে কর্তব্য সম্পাদন

করে সতীত্বের চরম নিদর্শন রেখে সহমৃতা হলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। স্বধর্মের জন্য কত বড় ত্যাগ। তাই না, মা! এদেরই উত্তরসূরী তোরা, মনে রাখিস। ভাল থাকিস।

ইতি — মা

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক সীতারাম

প্রিয় ধৃতি,

কেমন আছিস মা! আমরা এখানে সকলে ভালো আছি। গতকাল তোর একটা চিঠি পেলাম। চিঠি পড়ে একটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছি, মেয়ে আমার অনেক বড় হয়ে গেছে। আরে বাবা, অত চিন্তার কি আছে? একটু শরীর খারাপ হয়েছিল, এখন বেশ আছি। বয়স তো বাড়ছে বই কমছে না। এই বয়সে এরকম একটু হয়ই। অত চিন্তা করবি না। ও হ্যাঁ, তোর বাবা আজ তোকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আনন্দমঠ ও সীতারাম বই দুটি পোস্টে পাঠিয়ে দিয়েছে। পড়ে জানাবি, কেমন লাগল। আনন্দমঠ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের গীতা। 'বন্দেমাতরম্' গানটা শুনলেই বুকে কেমন শিহরণ ওঠে। জানিস তো মা, একসময় এই বন্দেমাতরম্ মন্ত্রকে সঙ্গে করে কত যুবক-যুবতী হেলায় দেশের জন্য প্রাণপাত করেছে। এক্ষেত্রে প্রথম সারিতে ছিল এই বীর বাঙ্গালী।

'ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন ঘরে আর রব না।'

তোর 'আনন্দমঠ' পড়তে চাওয়ার ইচ্ছেতে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন তোর দাদু। বাবা নাকি এই আনন্দমঠ পড়েই স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বইটা অবশ্য তোর ঠাকুরমার ইচ্ছায় তোকে পাঠানো হয়েছে। তোর ঠাকুমার বাপের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের ফরিদপুরে। এখানকারই মধুমতী নদীর তীরে ছিল রাজা সীতারামের রাজত্ব। একসময় যিনি অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সচেষ্টও হয়েছিলেন, কিন্তু তার এই প্রয়াসে কেউ সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয়নি। অবশ্য তোকে পাঠানো বইটা পুরোপুরি ঐতিহাসিক নয়। লেখক নিজেও সে দাবি করেননি। কিন্তু সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তোকে আজ রাজা সীতারামের ইতিহাস বলি। বাংলার সিংহাসনে তখন মুর্শিদকুলি খাঁ। দিল্লিতে নড়বড়ে মুঘল শাসক। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলা সদর থেকে ২৫-৩০ কিলোমিটার দূরে ভূষণা নামক একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে মধুমতী নদীর তীরে। এই নদীর অপর তীরে ছিল সীতারামের

রাজ্য। সীতারামের বাবার নাম উদয়নারায়ণ, মায়ের নাম দয়াময়ী। পাওয়া তথ্য অনুসারে সীতারামের জন্ম ১৬৫৮ সালে। প্রথম থেকেই সীতারামের একটি বৃহৎ হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প ছিল। ফলে তিনি আস্তে আস্তে শক্তি সঞ্চয়ে মন দেন। দিনে দিনে তিনি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। প্রচুর ধনসম্পদ ও কূটনীতির প্রয়োগ করে দিল্লির বাদশাহের সনদ নিয়ে আসেন এবং রাজা বলে স্বীকৃত হন। এই নবীন হিন্দুরাষ্ট্রের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মুসলমান রাজত্বে অত্যাচারিত হিন্দুরা দলে দলে তাঁর রাজ্যে আশ্রয় নেয়। ব্যবসায়ী, শিল্পী, বিদ্বানরা সীতারামের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

'ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর।।
(এখন) বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
(এখন) রামীশ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে।।'

কূটনীতিতে পারদর্শী নবীন এই হিন্দুরাজাকে মুসলমান নবাবের রোষ থেকে বাঁচানোর জন্য রাজ্যের রাজধানীর নাম রাখলেন মহম্মদপুর। রাজধানীর চারিধারে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে ঘিরে দেওয়া হল। প্রাচীরকে ঘিরে খনন করা হল সুগভীর পরিখা। দেওয়ালের স্থানে স্থানে কামান বসানো হল। সীতারামের হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কথা শুনে যেমন দলে দলে গুণী ব্যক্তি, ধনবানরা তাঁর রাজ্যে চলে এলেন, তেমনি এলেন বেশ কিছু তরতাজা যুবক। যারা ক্ষত্রিয় শক্তিতে বলীয়ান। মুসলমান অত্যাচারের বদলা নেওয়ার জন্য তাদের রক্তে আগুন জ্বলছে। সীতারাম তাদের নিয়ে গড়ে তোলেন তাঁর সেনাবাহিনী। গোপনে চলতে থাকে কামান, বন্দুক যোগাড়ের প্রচেষ্টা। সীতারাম রাজ্যের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নাগরিকের জন্য অস্ত্র শিক্ষা আবশ্যক করলেন। দলে দলে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখে দেখে নাগরিকরাও রণপ্রিয় ও সাহসী হয়ে উঠল।

'দড় বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে।
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণভঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে।।'

এদিকে ভূষণা ফৌজদার আবুতোরার রাজা সীতারামের পরিকল্পনা কিছুটা আঁচ পেয়ে নবাবের কাছে নালিশ জানালেন। কিন্তু সীতারামের কূটনীতির ফাঁদে পড়ে নবাব অভিযোগ শুনেও শুনলেন না। অপমানিত আবুতোরার এবার নিজেই সৈন্য সংগ্রহ করে সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে ফৌজদারের প্রাণ গেল, ধ্বংস হল ইসলামী সেনা। সীতারামের সেনাদল ভূষণা দখল করল। চারিদিকে সীতারামের জয়জয়কার পড়ে গেল। এবার নবাব কিছুটা চিন্তিত হলেন। তিনি একদল সেনা পাঠালেন সীতারামকে শায়েস্তা করতে। সেইসঙ্গে অন্য কোনও হিন্দুরাজা যাতে সীতারামের সাহায্যে এগিয়ে না আসে নবাব সে চেষ্টাও চালালেন। নিজ শক্তি বাড়ানোর

জন্য সীতারাম প্রস্তুতির জন্য আরও কিছুটা সময় চাইছিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন। সীতারামও সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। সীতারামের সেনা মরিয়া হয়ে লড়াই চালাল। কারণ তাদের যুদ্ধ ছিল স্বধর্ম, স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য। দলে দলে নবাব সেনা মরতে থাকে। একদল মুসলমান সেনা মরে তো আরেক দল তার জায়গা নেয়। কিন্তু সীতারামের হিন্দু সেনার সাহায্যে কেউ এগিয়ে এল না। টাকার লোভে একদল মানুষ সীতারামের বিরুদ্ধে নবাবের সঙ্গে একজোট হল। নিজের হাতে তৈরি সেনা জওয়ান ও নগরবাসীর প্রাণরক্ষার শর্তে সীতারাম নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু নবাবী সেনা কথা রাখল না। রাজা সীতারামের রাজ্য শ্মশানে পরিণত হল। বন্দী অবস্থায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামকে হত্যা করে। শেষ হয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

অনেক রাত হল, এবার তবে রাখি! ভালো থাকিস।

ইতি— মা

বীর চিলা রায়

স্নেহের ধৃতি,

কেমন আছিস মা! তোর সহপাঠীরা সকলে কেমন আছে! ওরে বাবা সহপাঠী কেন বলি, সহকর্মী বলতে হবে তো? না হলে আবার মেয়ে আমার রেগে যাবে। আমরা এখানে ভালো আছি। তোর ট্রেনিং কবে শেষ হচ্ছে? ট্রেনিং শেষে ছুটি দেবে তো, নাকি ওখান থেকেই সরাসরি বাহিনীতে যোগ দিবি? ও হ্যাঁ, তোর দাদু ঘোষণা করেছে যেদিন নাতনী ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার হয়ে বাড়ি ফিরবে, সেদিন সারা পাড়াকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে। আমার মামার বাড়িতে তোলা ছবিগুলি পাঠালাম। কোচবিহার যে কি সুন্দর জায়গা ছবিগুলি দেখলে বুঝতে পারবি। আজ তোকে এখানকারই এক বাঙালী বীরের কথা বলব, যার সাম্রাজ্য পশ্চিমে মিথিলা, পূর্বে অসমের প্রত্যন্ত সীমা, উত্তরে মহিমান্বিত হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তীরভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিক টয়ন্‌বি আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসের তিনজন বীরকে জন্মজাত যোদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। জানিস তো মা, সেই তিনজনের দু'জনই ভারতীয়। শিবাজী ও চিলারায়। তৃতীয় জন নেপোলিয়ান। এই বাঙ্গালী বীর চিলারায়ের কাহিনী আজ তোকে শোনাব।

১৪৯৮ সালে হোসেন শাহ কামরূপ-কামতা রাজ্যের রাজা নীলাম্বরকে ছলনায় পরাজিত করে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আত্মগোপনকারী নীলাম্বর হোসেন শাহের

পুত্র ডেনিয়েল সহ মুসলমান বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে। যুদ্ধে নীলাম্বরের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে সাম্রাজ্যের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের অভাবে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। এমনই এক সময় ১৫১৫ সালে বিশ্বসিংহ নামে জনৈক ভূস্বামী কামতাপুরে রাজ্য স্থাপন করে সিংহাসনে বসেন। কামতাপুর রাজ্যের সীমা তখন অসমের পশ্চিম ভাগ, উত্তরবঙ্গের একাংশ, ময়মনসিংহ নিয়ে গঠিত। বিশ্বসিংহের এক পুত্র চিলা রায়। বড় ভাই নরনারায়ণ রাজা হলে চিলা রায় সংগ্রাম সিংহ নাম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশ্চিম ভারতে তখন ইসলামী শক্তির দাপাদাপি। মুঘল, আফগানরা অস্তিত্বের লড়াই লড়ছে। বীর চিলা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তিনি জানতেন, মুঘল-আফগান যেই জিতবে ভবিষ্যতে তারা নবগঠিত এই হিন্দু রাজ্যকে কোনও মতেই সহ্য করবে না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য। চিলার নেতৃত্বে সারা রাজ্য জুড়ে বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা—

"বেজে উঠল যুদ্ধের দামামা।
বহুদিন পরে ডাক এসেছে আজ,
ওরে বাঙ্গালী সাজ তোরা সাজ।"

সেনাবাহিনীকে পদাতিক, অশ্বারোহী, গজ, নৌ, ধনুর্ধারী বাহিনীতে ভাগ করে নতুন করে গড়ে তোলা হল। চিলা রায় সৈন্যদের মধ্যে প্রখর দেশপ্রেম, দেশের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি, সৈন্যদের আর্থিক সুরক্ষা দিতে নানা প্রকল্প শুরু করলেন। যুদ্ধকালীন পরিবেশ এলেই যাতে সক্ষম মানুষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়, সেজন্য দেশবাসীর মনে লড়াকু মনোভাব তৈরি ও দেশজুড়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলেন।

'মাভৈঃ, ওঠরে, ও বাঙ্গালী বীর
কতকাল রবি নত করি শির—
শুনেছি রে জয় বাঙ্গালী জাতির,
অনাহত শব্দ ভেরীর মাঝে।।'

শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করেই বীর চিলা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানতেন, তার প্রধান শত্রু মুঘল-আফগানরা। এদের সঙ্গে লড়তে গেলে চাই বিরাট রসদ ভাণ্ডার। তিনি বিরাট সাম্রাজ্য গঠনের সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন। অহোম রাজ্য, কাছাড়, মণিপুর, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরা, খাসী বা খারাম, গারো রাজ্য, শ্রীহট্ট, ডিমরীয়া প্রভৃতি রাজ্য জয় করে ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে তিনি রাজধানীর দিকে রওনা হন।

বীর চিলা রায় নিজ বহুবলে নবগঠিত ক্ষুদ্র কোচবিহার রাজ্যটিকে প্রবল প্রতাপী শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। সেইসময় কোচবিহারকে কোচবেহার বলা হত। চিলা রায় যুদ্ধ জয় করে প্রত্যাবর্তনের সময় জরাজীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মঠমন্দির সমূহের পুনর্গঠন করেন। নিজ পূর্ব সীমান্ত সুরক্ষিত করে নবগঠিত হিন্দু রাজ্যটি ইসলামী

শাসকদের সঙ্গে শক্তি প্রদর্শনে নামে। বাংলার সুলতান সুলেমানকে পরাজিত করে মালদহ ও ঘোড়াঘাট অঞ্চল কোচ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। লেখক দয়াল কৃষ্ণ বরার লেখা 'ভক্তবীর চিলারায়' বই থেকে জানা যায়, সুলতান সন্ধি চুক্তি অনুসারে এক কন্যাকে চিলারায়ের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং রংপুর, উত্তর ময়মনসিংহের বাহিরবন্দ, ভিটারবন্দ, গয়াবারী ও শেরপুর অঞ্চলে বীর চিলার আধিপত্য মেনে নেয়। ইতিমধ্যে গৌড়ের নবাবের মৃত্যুর পর পুত্র দাউদ সুলতান হন। কোনভাবেই মুঘল তাকে পরাজিত করতে না পেরে কোচ রাজার সাহায্য চায়। বীর চিলারায় সময় অপচয় না করে মুসলমান রাজ্যের বিরুদ্ধে মুসলমানকে লড়িয়ে দেয়। চিলার নেতৃত্বে ১৫৭৬ সালে বাংলা থেকে মুসলমান রাজত্ব শেষ হয়। আমরা ইতিহাসে পড়ি আকবর কখনও বাংলা জয় করতে পারেনি। কিন্তু আসল কারণটা কোথাও লেখা হয়নি। কারণ, বাংলা জয় করতে হলে তাকে লড়তে হত বীর চিলার বিরুদ্ধে। সে সাহস হয়ত আকবরের ছিল না।

মাত্র ৬১ বছর বয়সে ভারতের এই মহান বীরের প্রয়াণ ঘটে। দুঃখের চেয়েও বেশি লজ্জার বিষয়, এমন বীরের ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায়নি।

"তোরা কেন ভাবিস্ এত, বড় কে তাদের মত,
তোদের মত কেবা বলীয়ান।
তোদের পূর্বপুরুষগণ, একদিন এই ত্রিভুবনে,
উড়িয়েছিল বিজয় নিশান।
ভালো থাকিস।

ইতি— মা

ভগবান দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

প্রিয় ধৃতি,

কেমন আছিস মা! আমরা পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় সবাই ভালো আছি। অনেক দিন হল তোর কোনও চিঠি পাইনি। জানি, ওখানে তুই খুব ভালো আছিস, তাও মনটা কেমন করে। নিয়মিত ফোনে কথা হলেও সে তো কয়েক মিনিটের জন্য। চিঠিটা হাতের কাছে থাকলে ওটাই বারবার উল্টেপাল্টে দেখি। সময় করে মাঝে মধ্যে তুই একটা চিঠি লিখিস মা। আচ্ছা ওসব কথা ছাড়, তোর বাবা বলছিল, এবার নাকি তোদের ভারত-তিব্বত সীমান্তের কোনও একটি বায়ুসেনার ঘাঁটিতে ফিল্ড ট্রেনিং হবে। দারুন, আমার তো শুনেই শিহরণ লাগছে। চারিদিকে তুষার আবৃত হিমালয়, তার মাঝে শত্রুসেনাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তীরবেগে উড়বে আমার ঘরের মেয়ে। জানিস

মা, যাকে আজ তোরা ভারত-চীন সীমান্ত বলিস, একদিন আমাদের সীমান্তের ঠিক ওপারে ছিল স্বাধীন দেশ তিব্বত। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বলতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও অদূরদর্শী বৈদেশিক নীতির ফল তিব্বতের পরাধীনতা। তোর মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জাগছে, আমরা তো কখনও কাউকে আক্রমণ করিনি, তবে আমাদের দোষে কেন একটি স্বাধীন দেশ পরাধীন হবে? উত্তর দিতে গেলে সেই চির সনাতন সত্যই বলতে হয়। সমাজের সজ্জন, সাধু মানুষেরা যখন শান্তির দোহাই দিয়ে দুষ্কৃতিদের দোষকে দেখেও না দেখার ভান করে তখনই সমাজের অধঃপতন শুরু হয়। যখন চীনা সেনা তিব্বতকে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধছিল আমাদের রাজনেতারা তখন হিন্দি-চীনি ভাই ভাই করে লাফাচ্ছিল। আজ চীনা দৈত্য আমাদের দোরগোড়ায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবও বলেছেন, কামড়াতে হবে না, মাঝে মধ্যে ফোঁস করতে হবে।

সেদিন যদি ভারত সামান্য প্রতিবাদ করত তবে হয়ত তিব্বতের ইতিহাস আজ অন্যরকম হত।

তুই শুনলে অবাক হবি, এই তিব্বতে বাঙালিদের খুব সম্মান। কারণ, তিব্বতবাসীকে জ্ঞানের আলো দেখিয়েছিলেন এক বাঙালি। আজও তিব্বতীয় লামা ও সাধারণ মানুষ সে কৃতজ্ঞতা মুক্তমনে তা স্বীকার করে। এখন তোকে বলব দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিহাস। যাকে তিব্বতীরা অতীশ দীপঙ্কর নামে ডাকে। 'অতীশ' কথার অর্থ 'প্রভু'।

৯৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙলার বিক্রমপুরের এক রাজবংশে দীপঙ্করের জন্ম। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। পিতা কল্যাণশ্রী ও মাতা প্রভাবতী। শিক্ষা শেষে বিখ্যাত ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য শীলভদ্রের নিকট দীক্ষা হয় যুবক আদিনাথের। দীক্ষার পর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। বুদ্ধের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে দীপঙ্কর প্রথমে ব্রহ্মদেশ এবং পরে সেখান থেকে সুবর্ণদ্বীপে যান। দীর্ঘকাল সুবর্ণদ্বীপে থাকার পর তিনি সিংহল মানে এখনকার শ্রীলঙ্কায় যান। পালরাজ মহীপালের আমন্ত্রণে সিংহল থেকে ফিরে দীপঙ্কর সেসময়ের বিশ্বের সবচেয়ে নামী বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পাণ্ডিত্যের মহিমা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিব্বতরাজ য়ে-শেষ-হোড বারবার আচার্য দীপঙ্করকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানান। শোনা যায়, তিনি নাকি অর্ধেক রাজ্যও আচার্যকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বতরাজের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুর আগে তিব্বতরাজ আচার্য দীপঙ্করের কাছে আবার কাতর প্রার্থনা জানান। একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছা রক্ষার্থে আচার্য দীপঙ্কর নিজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তিব্বতের দুর্গম পথে রওনা হন। অতি কষ্টে তিব্বতে পৌঁছালে নতুন তিব্বতরাজ তাঁকে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা করেন। আচার্য দীপঙ্কর তিব্বতীদের বহু কুরীতি দূর করেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষার অনেক গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তিব্বত জুড়ে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ছড়িয়ে দেন জ্ঞানের আলো।

‘বাঙালি অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর।
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালি দীপঙ্কর।।’

অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা আমাদের ঘরের ছেলেকে ভুলেছি, কিন্তু তিব্বতীরা ভোলেনি। এখনও তিব্বতের বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে নিয়মিত ‘অতীশ’ দীপঙ্করের বন্দনা-অর্চনা চলে। তিব্বতীয় গ্রন্থে আচার্য অতীশ দীপঙ্করের কৃতজ্ঞতায় পাতার পর পাতা এখনও লেখা হয়। বিনা রক্তপাতে সেদিন তিব্বতের উপর সাংস্কৃতিক জয় পতাকা উড়িয়েছিলেন বাঙালী দীপঙ্কর। এমন পূর্বপুরুষের সন্তান আমরা, একথা মনে রাখবি সবসময়।

‘গভীর ওঙ্কারে হুঙ্কারি দেরে ডাক
শিহরি ওঠুক বিশ্ব, মেদিনীটা ফেটে যাক।
আমাদের জন্মভূমি, দেবতার লীলা ভূমি,
দেবগণ আসুক নেমে পূর্ণ হউক কামনা।।
সার্থক হবে তবে এ জনম সবাকার,
ছেলের গৌরবে হবে গরবিনী মা আমার।’

তোর চিঠির অপেক্ষায় রইলাম।

ভালো থাকিস।

ইতি— মা

ভূষণারাজ মুকুন্দ রায়

স্নেহের ধৃতি,

কেমন আছিস মা? আমরা সকলে পরম করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি। কাল তোর একটা চিঠি পেলাম। অনেকদিন পর তোর হাতের লেখা দেখতে পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল ছোট্ট ছোট্ট হাতে আমার ছোট্ট ধৃতি যেন আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। ও ভালো কথা, তোর বাবা বলছিল, তোদের গ্রুপে নাকি একটি বাঙালি মেয়ে যোগ দিয়েছে। ভালো হয়েছে। অন্তত দিনের শেষে একবার মাতৃভাষায় দু-দণ্ড কথা বলতে পারবি। এটাই কম কি! কাল একটি পত্রিকায় পড়ছিলাম আমাদের দেশেই নাকি সবচেয়ে বেশি ভাষাভাষীর লোক বাস করে। আচ্ছা, তোর বাবার মুখে শুনলাম, মেয়েটির বাড়ি নাকি আন্দামানে। ওদের পূর্বপুরুষের ভিটে নাকি বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর শহরের নিকটবর্তী ভূষণা অঞ্চলে। এতসব তথ্য যখন

যোগাড় করে ফেলেছিস, তাতে একটা বিষয়ে আমি পরিষ্কার, তোর সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা বেশ জমেছে। জানিস মা, এই ভূষণার এক বাঙালি বীর মোগলদের ক্ষমতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বছরের পর বছর দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছে! যদিও সেই বাঙালির ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকে দুটি লাইনেও স্থান পায়নি।

“জাগিল স্মৃতিতে পূরব গরীমা কালিমা মুছাতে হবেই হবে।”

আজ আমি তোকে শোনাব এই বাঙালি বীরের জীবনগাথা। মধুমতী নদীর শাখা বরাশিয়া নদীর তীরে ভূষণা নামে একটি ছোট্ট রাজ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি, সারা বাংলা যেন রণভূমি। মোগলদের সঙ্গে পাঠানদের সীমাহীন প্রতিহিংসা শুরু হয়েছে। আবার ইসলামী শক্তিকে তাল ঠুকে বাঙালি হিন্দু রাজারাও স্বমহিমায় ফিরছে। কখনও মোগল তো কখনও পাঠানদের সঙ্গে নিয়ে বাঙালি হিন্দুশক্তি যেন বাংলাকে ইসলামী শাসন থেকে মুক্ত করার পণ নিয়েছে। এমনই এক যুগের সন্ধিক্ষণে বীর যোদ্ধা মুকুন্দ রায় ভূষণাকে রাজধানী করে একটি ছোট্ট রাজ্য গড়ে তোলেন। মুকুন্দ রায়ের রাজ্য ছোট হলেও কোনমতেই দুর্বল ছিল না। চতুর কূটনীতিবিদ মুকুন্দ রায় জানতেন, মোগল বা পাঠান যারাই জিতুক, নবগঠিত হিন্দু শক্তিগুলিকে কখনই সহ্য করবে না। তাই তিনি কখনও মোগলদের, কখনও পাঠানদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে শক্তিসাম্যের জটিল রাজনৈতিক খেলা শুরু করলেন। অন্যদিকে আশপাশের হিন্দু রাজা-জমিদারদের নিয়ে একটি শক্তি জোট গড়তে সচেষ্ট হলেন। ১৫৭৫ সালে মোগলমারী যুদ্ধে পাঠান রাজা দায়ুদ পরাজিত হয়ে উড়িশ্যায় পালিয়ে যায়। মোগলরা জানত, নবগঠিত হিন্দুশক্তি যদি একজোট হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে বেঁচে ফেরা মুশকিল। তাই তারা কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে বড় বড় হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে এবং ছোট হিন্দু রাজ্যগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোগলদের চালাকি হিন্দু রাজারা বুঝলেও নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় তারা চুপ থাকে। মোগল সেনাপ্রধান মুনিম খাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মুরাদ খাঁ ভূষণা দখল করতে এগোলেন। রাজা মুকুন্দ রায় আগে থেকেই তৈরি ছিলেন। সারা রাজ্যে তখন রণ উন্মাদনা। মোগলদের কাছে পরাজয় মানে ভূষণার বিনাশ। তাই ভূষণাবাসীর কাছে এ যুদ্ধ মরণ-বাঁচন লড়াই।

গুপ্তচর মারফত মুরাদ খাঁ ভূষণার যুদ্ধের প্রস্তুতি বিষয়ে সবই জানলেন। বলতে পারিস, ভূষণারাজের পরোক্ষ সহযোগিতায় একটু বেশিই জানলেন। ফলে পাঠান বিজেতা মুরাদ খাঁর বুকেও কাঁপুনি ধরল। এবার খাঁ সাহেবও যেন তেন উপায়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। তিনি ভূষণারাজকে জানালেন, নিয়মিত রাজস্ব দানের প্রতিশ্রুতি পেলে মোগলসেনা যুদ্ধে যাবে না। ভূষণারাজ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। যদিও মুরাদ খাঁর রাজস্ব সংগ্রহের বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

তবে হ্যাঁ, মোগল ফৌজ ভূষণার কাছে ফতেহাবাদে ছাউনি ফেলে মুরাদ খাঁর নেতৃত্বে বসে রইল। যদি একটা সুযোগ পাওয়া যায় ভূষণা দখলের। ভূষণারাজও তার প্রতিশ্রুতি

রক্ষার প্রয়োজন মনে করেননি। ইতিমধ্যে গৌড়ে মহামারীতে হাজার হাজার মোগল সেনা প্রত্যহ মরতে থাকল। মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁও মহামারীতে মারা পড়ল। মোগল সেনাপতির মৃত্যুসংবাদে সারা বাংলা যেন মোগলদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিজ সৈন্যদের বাঁচাতে আকবর সেনা নিয়ে এগিয়ে এলেন। রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলেও রাজ্যজুড়ে হিন্দু রাজাদের দাপটে বহু মোগল সেনাপতির প্রাণ গেল। শেষপর্যন্ত রাজপুত রাজ মানসিংহ মোগলদের রক্ষাকর্তা হয়ে এগিয়ে এলেন। এদিকে মোগল সুবেদার মুজঃফর খাঁ মোগল সেনাপতিদের বিদ্রোহে প্রাণ দিল। যুদ্ধে প্রাণ গেল বিদ্রোহী মুরাদ খাঁরও। মুকুন্দ রায় এমন একটি সময়ের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তিনি আক্রমণ করে ফতেহাবাদের ইসলামী সেনাকে ধ্বংস করে মুরাদ খাঁর জায়গীরগুলি নিজ দখলে নিলেন। সুযোগ থাকলেও মোগল সেনাপতিরা মুকুন্দ রায়ের জীবদ্দশায় ভূষণার দিকে আর হাত বাড়াবার সাহস পায়নি। যদিও বিধাতার পরিহাসে মুকুন্দ রায়ের ঐক্যবদ্ধ হিন্দু রাজ্য গড়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। যদি হতো তবে হয়ত আজ আমাদের বাংলাকে এভাবে ভাগ হতে হত না। কোটি কোটি মানুষ নিজ জন্মভূমি, ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হতো না।

'বীর প্রসবিনী জননী মোদের, বীরের জাতি, আমরা বীর।'

আজ তবে রাখি মা, ভালো থাকিস।

ইতি— মা

বরিশালের বিক্রম

প্রিয় ধৃতি,

আশাকরি পরমকরুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছিস। আমরা এখানে সবাই ভালো আছি। আজ মনটা ভালো নেই মা। শুধু কি আমার, বাড়ির সবারই মন খুব খারাপ। জানিস মা, তোর কানু দাদুর শরীর খুব খারাপ। আজ তোর বাবা ও পাড়ার রজত কাকুরা মিলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে। তোর বাবা তো বলল অবস্থা নাকি খানিকটা ভালো, কিন্তু ডাক্তার কোনও আশা দেননি। তোর দাদুর সাথে তো কানু জ্যাঠার সম্পর্ক কোনও কালেই ভালো ছিল না। সেই তোর দাদুও কানুজ্যাঠার অসুখের কথা শুনে কেমন মনমরা হয়ে গেছে। তুই এখন বড় হয়েছিস, তাই বলছি। এ বাড়িতে আসার পর থেকে দেখেছি কানু জ্যাঠা কি কষ্ট করে তিন ছেলেকে মানুষ করেছে। নিজ পরিবারের বাইরে কখনও এক ফোঁটাও ভাবেনি। সবসময় সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন আমার তিন ছেলে, আমার কারো সাহায্যের দরকার

নেই। নিজ স্বার্থে বয়সকালে কি না করেছেন। আজ সেই মানুষ কতটা অসহায়। তিন ছেলেই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ গড়তে ব্যস্ত। তাদের কাছে আজ বাবা-মার জন্যেও সময় নেই। তোর বাবা ফোন করেছিল বড় ছেলের কাছে। বড় ছেলের উত্তরে হতবাক হলেও সুরটা খুব চেনা চেনা ঠেকছিল। তোর বাবাকে বলেছে, মুখার্জিদা আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরটা এসএমএস করে দিন। আমি টাকা পাঠাচ্ছি, একটু ম্যানেজ করে নিন। আমার সামনে একটা প্রমোশনের কথা চলছে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। কানু জ্যাঠা এই আমাদের বাড়ির দালানে বসে তোর দাদুকে বলত, 'মুখার্জি, টাকাই সব বুঝলে, সমাজ, ধর্ম, দেশ—এগুলি বইয়ে পড়তেই ভালো লাগে।' এই নিয়ে তোর দাদুর সাথে কত তর্কাতর্কি চলত। জীবন তিনটে চাকার উপর বসানো। পরিবার, সমাজ ও দেশ। এর যে কোন একটা একটু গড়বড় করলেই নেমে আসে বিপর্যয়। সমাজ দেশ না থাকলে ব্যক্তির কি দাম বলত? পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কিসের অভাব ছিল। তাদের কেন দেশ ছাড়তে হল? চোখের সামনে কেন মাতৃজাতি, দেব মন্দির বিপর্যয়ের শিকার হল। কারণ আমরা 'আমি-আমার পরিবার' এই চক্রেই আটকে ছিলাম। দেশ, ধর্ম, জাতির জন্য এক ফোঁটা ভাবিনি। দুঃখ লাগে চোখের সামনে সেই বিভৎসতা দেখার পরও আমাদের একফোঁটা বদল হয়নি।

এই দেখ না, কানু জ্যাঠার বাড়ি ছিল বরিশালে। জ্যাঠামশায়ের মুখেই শুনেছি ওঁনারা নাকি এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাও তিনি সারাটা জীবন 'আমি ও আমার পরিবার'ই করে গেলেন। ভগবানের কি পরিহাস দেখ, তার সবচেয়ে খারাপ সময়ে এই সমাজই এগিয়ে এসেছে। পরিবার নয়। আজ সেই বরিশালেরই এক হিন্দু বীরের ইতিহাস বলি। বরিশাল জেলার প্রাচীন নাম ছিল বাক্‌লী। সংস্কৃত পণ্ডিতরা বলত চন্দ্রদ্বীপ। চোদ্দোশ শতকের প্রারম্ভে রমানাথ দে নামক জনৈক বীর নিজ বাহুবলে বাক্‌লীর রাজা হন। তার উপাধি ছিল দনুজমর্দন। রাজ্য ছোট হলেও বাক্‌লী রাজের শক্তি কম ছিল না ফলে ইসলামী শাসকেরা তার সাথে বিবাদে যায়নি।

রমানাথের বংশ কয়েকপুরুষ রাজত্ব করার পর বাক্‌লীর রাজা হন বলভদ্র বসু। তিনি ছিলেন বাক্‌লী রাজের জামাই। বলভদ্রের ছেলের নাম রাজা পরমানন্দ। তার রাজত্বকাল বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা চরম ডামাডোল। সময়টা ১৫৬৩। সুলেমান খাঁ করনানী নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করলেও তার রাজত্ব শুধু রাজধানী পর্যন্তই সীমিত। দিকে দিকে হিন্দু জমিদার, রাজাদের বাড়বাড়ন্ত।

বাক্‌লীরাজ পরমানন্দ ১৫৫৯ সালে গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে পর্তুগীজরা চট্টগ্রামের বদলে কেবলমাত্র বাক্‌লী বন্দর সমূহের সাথে বাণিজ্য করতে বাধ্য হয়। বাকলী রাজকে কর দিতে স্বীকৃত হয়। বদলে বাক্‌লী রাজ তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। সন্ধির শর্ত থেকেই বোঝা যায় পরমানন্দ একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন। পরমানন্দের পর রাজা হন জগানন্দ। তার রাজত্বকালে

১৫৮৪ সালে এক ভয়ঙ্কর জলপ্লাবনে বাক্‌লীর সমূহ ক্ষতি হয়। রাজধানী কচুয়া প্রায় ধ্বংস হয়। বাক্‌লীরাজ জগানন্দ সহ বহু মানুষ মারা যায় এই জলপ্লাবনে। এবার রাজা হন কন্দর্পনারায়ন। তিনি মাধবপাশায় নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন। ইংরাজ পর্যটক রেলফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ সালে বাক্‌লীরাজ কন্দর্পনারায়ণের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি লিখছেন, 'বাক্‌লীরাজ কারো অধীন নয়, তিনি একজন পরাক্রমশালী স্বাধীন রাজা।' কন্দর্পনারায়ণের পর রাজা হন রামচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের জামাই। ১৬১১ সালে মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁ একযোগে গিয়াস খাঁকে যশোহর ও সৈয়দ হাকিমকে বাক্‌লী জয়ে পাঠালেন। বাক্‌লীর দিকে দিকে রণবাদ্য বেজে উঠল।

"সাজ সাজ সকলে রণসাজে - শোন ঘনঘন রণভেরী বাজে,
চল সময়ে দিব জীবন ঢালি - জয় মা ভারত জয় মা কালী।" মুঘলদেরকে আটকাতে ২০ বছরের যুবক রাজা রামচন্দ্র বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে অপেক্ষা শুরু করলেন। শুরু হল যুদ্ধ। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, ৭ দিন অবিশ্রাম যুদ্ধ চলল। ইসলামী সেনা বাক্‌লীর বাহিনীর সামনে দাঁড়াতেই পারছিল না। বাক্‌লী বাহিনীর মুখে তখন একটাই গান—

"আরতি রক্তে কবির স্নান - করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।"

আরও মুঘল ফৌজ এল। এদিকে বাক্‌লী বাহিনীর সংখ্যা কমতির দিকে। অনেকে রামচন্দ্রকে সন্ধির কথা বলল। রাজমাতাও সন্ধির পক্ষে রায় দিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও তার বাহিনী যুদ্ধকেই বেছে নিল।

"যদি না থাকে যাই অদৃষ্টে - অধর্ম সঙ্গে করিনা সন্ধি,
রব না রব না শত্রুর ভৃত্য - সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু।"

বেশ কিছুদিন যুদ্ধ চলল। দুই পক্ষই নাছোড়। বাক্‌লীর প্রজার কথা ভেবে রামচন্দ্র কিছুটা নরম হলেন। অন্য দিকে মুঘল বাহিনীর অবস্থাও বেশ বেকায়দায়,। ফলে দুই পক্ষই সন্ধির পক্ষে মত দিল। রক্ষা পেল বাক্‌লী। আর কখনও ইসলামী শক্তি বাক্‌লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি। কিন্তু যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই এই হিন্দু রাজ্যের গৌরব ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে গেল। আমরা বীরের সন্তান। আমাদের আছে গৌরবময় ইতিহাস। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সে ইতিহাস আজ আমাদের সামনে লুকিয়ে রাখা হয়। জানিনা তাতে কার স্বার্থ রয়েছে।

"সব শত্রুকে পরাজিত করি আমরা লভেছি জয়
রণকৌশলে আমরা রেখেছি শৌর্যের পরিচয়।
ডরি নাকো তাই কোন দস্যুরে
যুঝিতে তাদের সমুখ-সমরে
বলীর দর্প করিব খর্ব কর সবে দৃঢ় পণ,
হিন্দু ভারত কাপুরুষ নয় জানুক বিশ্বজন।।"

ভালো থাকিস। ইতি— মা

তথ্যসূত্র—

১. বাংলাদেশের ইতিহাস - রমেশচন্দ্র মজুমদার
২. বাংলার ইতিহাস - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৩. বীরত্বে বাঙালী - জগদীশচন্দ্র ঘোষ
৪. প্রতাপাদিত্য - রামরাম বসু
৫. বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশ
৬. রামায়ণ - কৃত্তিবাস ওঝা
৭. মহাভারত - কাশীরাম দাস
৮. মনসামঙ্গল - বিজয় গুপ্ত
৯. অন্নদামঙ্গল - ভারতচন্দ্র
১০. চৈতন্য ভাগবত - বৃন্দাবন দাস
১১. চৈতন্য চরিতামৃত - কৃষ্ণদাশ কবিরাজ
১২. আনন্দমঠ - বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৩. ভক্তবীর চিলা রায় - দয়াল কৃষ্ণ বরা
১৪. চারণকবি মুকুন্দ দাস রচনাসমগ্র
১৫. রবীন্দ্র রচনাবলী
১৬. বন্দনা
১৭. নানা লোকগাথা